

BBGLA-135

Modern Indian Language: Bengali



পাঠ্যক্রম সম্পর্কে:

বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টি রেখে আধুনিক ভারতীয় ভাষা(এমআইএল) হিসাবে বাংলার পাঠ্যক্রমটিকে গড়ে তোলা হয়েছে। আশা করা যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই সমৃদ্ধ ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি খুলে স্বল্প পরিসরে হলেও ছাত্রছাত্রীরা অমূল্য সাহিত্যগ্রন্থগুলির হৃদিস লাভ করতে পারবেন। বাংলা ভাষার বিশেষ জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় দক্ষতাও তাঁরা এখান থেকে অর্জন করবেন। বাংলার সমাজ,সংস্কৃতি ও আন্দোলনসমূহের নির্যাস বিভিন্ন সময়ে বাংলা সাহিত্যে যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে তার একটি পরিচয়ও এই পাঠ্যক্রম ধরে রেখেছে। ছাত্রদের সংবেদনশীল মনোভাব যাতে বিকশিত হয়, পাঠ্যক্রমটির নির্মাণ প্রকৃয়ায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সাহিত্যকে সঙ্গী করে কিভাবে প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা করা যায় এবং সেখান থেকে উত্তোরণের পথও যাতে তারা সাহিত্যের মধ্য থেকে দেখতে পায় সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

সমগ্র পাঠ্যক্রমটি তিনটি ব্লকে এবং ব্লকগুলি যথাক্রমে পাঁচ, চার এবং চার (৫,৪,৪) এককে ভাগ করা হয়েছে।

ব্লকগুলি সম্পর্কে:

ব্লক-১(পাঁচটি একক) বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এই ব্লকটি পড়ার পরে ছাত্রছাত্রীরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের একটি রূপরেখাগত পরিচয় পাবেন। বাংলা ভাষার উদ্ভব, বিকাশ এবং সাহিত্যের তিনটি যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবগত হবেন। এছাড়া বাংলার বিশেষ বাগবিধি – যা বাংলা ভাষাকে অন্যান্য ভাষা থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, সে সম্পর্কেও তাঁরা জানতে পারবেন।

ব্লক-২(চারটি একক) মৌখিক ঐতিহ্য ও গদ্য রচনা

এই ব্লকটি পড়ার পরে ছাত্রছাত্রীরা সংক্ষেপে বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে অবহিত হবেন। সেই সঙ্গে বাংলার লোক-ঐতিহ্যের ধারাটি সম্পর্কেও জানতে পারবেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা গদ্যের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা হবে।

ব্লক-৩ (চারটি একক) মানবতাবাদ ও সাহিত্যের আন্দোলনসমূহ

এই ব্লকটি ছাত্রদের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করবে। বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা সাহিত্যিক আন্দোলনগুলির উদ্ভব এবং কবিতায় নানা সময়ে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধ কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা ছাত্রছাত্রীরা জানবেন।

EXPERT COMMITTEE

Dr. Sharmistha Sen

Associate Professor, Zakir Husain College
University of Delhi, Delhi-110007

Prof. Malati Mathur

Director-School of Humanities, IGNOU

Dr. Nandita Basu

Professor (Retired) Modern Indian
Language and Literary Studies,
University of Delhi, Delhi-110007

COURSE COORDINATOR

Prof. Malati Mathur
Director, School of Humanities
IGNOU, New Delhi-110068

COURSE EDITOR

Dr. Sharmistha Sen

Associate Professor, Zakir Husain College
University of Delhi, Delhi-110007

BLOCK PREPARATION

Block & Unit**Writer**

Bl 1 Unit 1,2&4

Dr. Sreeta Mukherjee, Asst Prof. Dayal Singh College, University of Delhi

Bl 1 Unit 5

Dr. Sharmistha Sen, Assoc Prof. Department of Bengali, Zakir Husain Delhi College,
University of Delhi

Bl 2 Unit 1,2& 3

Mr. Samrat Hembrom, Asst Prof. Department of Bengali, Zakir Husain Delhi College,
University of Delhi

Bl 2 Unit 4

Dr. Tamanna Emi, Asst Prof. Kirori Mal College, University of Delhi

Bl 3 Unit 2&3

Dr. Tamanna Emi, Asst Prof. Kirori Mal College, University of Delhi

Bl 3 Unit 4

Dr. Sreeta Mukherjee, Asst Prof. Dayal Singh College, University of Delhi

Some units have been adapted from existing IGNOU material

Cover design: Mr. Tamal Basu, IGNOU panel

Printed and published on behalf of the Indira Gandhi National Open University, New Delhi by Registrar,
MPDD.

ব্লক- ১ একক-১

বাংলা ভাষার বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

BL-1 UNIT-1

গঠন

১.১.১ উদ্দেশ্য

১.১.২ প্রস্তাবনা

১.১.৩ প্রথম ভাগ – বাংলা ভাষার জন্ম ও শ্রেণী বিভাগ

১.১.৪ সারাংশ

১.১.৫ দ্বিতীয় ভাগ – প্রাচীন বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

১.১.৬ সারাংশ

১.১.৭ তৃতীয় ভাগ – মধ্য বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

১.১.৮ সারাংশ

১.১.৯ চতুর্থ ভাগ – আধুনিক বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও উপভাষা

১.১.১০ সারাংশ

১.১.১১ নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

১.১.১২ উত্তর সংকেত

১.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি ভারতবর্ষে ভাষার বিস্তার ও তার সম্প্রসারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা গোষ্ঠীতে বাংলা ভাষার স্থান ও তার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন। বাংলা ভাষার ক্রমিক ভাষাতাত্ত্বিক রূপ পরিবর্তন ও তার সম্পূর্ণ গঠনের দিকটি সম্পর্কেও এখানে বলা হয়েছে।

১.১.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষার বিবর্তনের স্তরপর্যায় ও বৈশিষ্ট্য

এই এককে প্রথমেই বলে নেওয়া হবে ইন্দো ইউরোপীয় আৰ্য ভাষা থেকে বিবর্তনের সূত্র মেনে ইন্দো ইরানীয় আৰ্য ভাষা থেকে ভারতীয় আৰ্য ভাষা হয়ে ক্রমশ বাংলা ভাষা নব্য ভারতীয় আৰ্য ভাষা হিসাবে কিভাবে রূপ পরিগ্রহণ করল। এর পরে সেই নতুন জন্ম নেওয়া বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের, মধ্য যুগের ও আধুনিক যুগের ধ্বনিগত ও রূপগত বদলের চিত্রটিকে নির্দিষ্ট ক্রমে তুলে ধরা হবে। বাংলা ভাষা আধুনিক যুগে পদার্পণ করার পর তার উপভাষার যে বৈচিত্র্যময় রূপটি প্রকাশ পেয়েছে, তার ব্যাপারেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই এককে করা হয়েছে।

১.১.৩ প্রথম ভাগ - বাংলা ভাষার জন্ম

সারা পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষাকে প্রথমে তাদের সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রধানত বারোটি ভাষাবংশে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। যেমন – ইন্দো-ইউরোপীয় বা আৰ্য, সেমীয়-হামীয়, বাস্টু, ফিনো-উগ্রীয়, তুর্ক-মঙ্গোল-মাধু, ককেশীয়, দ্রাবিড়, আফ্রিক, ভোট-চীনীয়, উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয়, এস্কিমো, আমেরিকার আদিম ভাষাগুলি ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রথম ও প্রধান ভাগ ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বা আৰ্য ভাষা। এই ভাষাবংশটি ভৌগোলিক বিস্তার ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির দিক থেকে এগিয়ে ছিল। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশই হল বাংলা ভাষার আদি উৎস।

আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে এই ভাষার মানুষেরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং কালক্রমে এর থেকে জন্ম নেয় দশটি প্রাচীন ভাষা, যেমন – ইন্দো-ইরানীয়, বালতো-স্লাবিক, আলবানীয়, আর্মেনীয়, গ্রীক, ইতালীক, টিউটনিক, কেলটিক, তোখারীয়, হিট্টীয়। এর মধ্যে প্রথম ও প্রধান ভাষার নাম ছিল ইন্দো-ইরানীয় ভাষা। এই ভাষাভাষী মানুষেরা নিজেদের আৰ্য বলে পরিচয় দিত। তারা একসময় দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সময়টা ছিল মোটামুটিভাবে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। একটি শাখা ইরানে গিয়ে ইরানীয় আৰ্য ভাষার সূত্রপাত ঘটালো। অন্য ভাগটি ভারতীয় আৰ্য উপশাখা নাম নিয়ে ভারতে প্রবেশ করল ও প্রাচীন ভারতীয় আৰ্যভাষার সূচনা করল। প্রাচীন ভারতীয় আৰ্যভাষার দুটি রূপ ছিল – কথ্যরূপ ও সাহিত্যিক রূপ। অঞ্চল বা প্রদেশের ওপর ভিত্তি করে মধ্যযুগীয় ভারতীয় আৰ্য ভাষার যুগে কথ্যরূপটির চারটি শাখার জন্ম হল – প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয়, দাক্ষিণাত্য। প্রাচ্য শাখা থেকে প্রাচ্যা ও প্রাচ্যমধ্য উপশাখার জন্ম হল। সেই প্রাচ্যা ভাষা থেকে মাগধী প্রাকৃত ও পর্যায়ক্রমে সেখান থেকে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্টের মধ্যে দিয়ে

একসময় বাংলা ভাষার জন্ম হল। সময়টা ছিল আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই হল বাংলা ভাষার জন্মের ইতিবৃত্ত। এই একই সময়কালে বাংলা ছাড়াও ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, মারাঠী, সিন্ধী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষারও জন্ম হয়। এদের একসাথে বলা হত নব্য ভারতীয় আর্যভাষা।

এখন ভাষা হল এক সজীব সত্তা। তার বদল অনিবার্য। বদল বা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই যে কোনো ভাষা সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলে। বাংলা ভাষার জন্মের পরে সময় থেকে সময়ান্তরে তার মধ্যে নানা বদল লক্ষ্য করা গেল। এই বদলের দিকে দৃষ্টি রেখে বাংলা ভাষার কয়েকটি ভাগ করা হল।

১.১.৪ সারাংশ

এই অংশে আমরা দেখলাম যে কিভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার মধ্যে দিয়ে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়কালে ভারতবর্ষে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম হল। এর পরে সেই ভাষার কথ্য রূপটির মধ্যে দিয়ে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা হয়ে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম লাভ করল। পূর্ব ভারতে জন্ম নেওয়া এরকম এক নব্য ভারতীয় আর্যভাষা হল বাংলা। কিন্তু জন্ম নেওয়ার পরে সেই ভাষা ক্রমাগত রূপ বদলাতে থাকল। এবং এর ফলে বাংলা ভাষাকে কয়েকটি যুগে ভাগ করে নেওয়া হল, যার পরিচয় পরবর্তী অংশের আলোচনায় পাওয়া যাবে।

১.১.৫ দ্বিতীয় ভাগ – প্রাচীন বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন বাংলা ভাষা –

এই যে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বাংলার জন্ম হল ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, এই ভাষার নাম দেওয়া হল বাংলা ভাষা। এই বাংলা ভাষাকে নির্দিষ্ট কিছু ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণের বিচারে কয়েকটি কালপর্ব বা যুগে বিভাজন করে নেওয়া হল। এর মধ্যে সবচেয়ে আদি পর্ব হল প্রাচীন বাংলা ভাষা। মনে করা হয় এই ভাষার যে যুগ, তার সময়সীমা ছিল ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ। তবে সঠিক বিচারে এর বিস্তার কেবলমাত্র ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দই ছিল। কারণ এই সময় পর্যন্তই প্রাচীন বাংলা ভাষার চর্চা হয়েছিল। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের কালপর্বের মধ্যে বাংলা ভাষায় রচিত কোনো গ্রন্থের পরিচয় না পাওয়া যাওয়ার ফলে, এই সময়কালকে ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ‘অন্ধকার যুগ’ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

প্রাচীন বাংলা ভাষা পর্বের বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হল বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত ‘চর্যাপদ’। ‘অমরকোষের টীকা’ ও ‘সেকণ্ডভোদয়া’-কেও এই যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন বলে অনেকে মনে করে থাকেন।

এই যুগের বাংলা ভাষার বেশ কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রথমে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

১) প্রাচীন বাংলা ভাষায় সমব্যঞ্জে গঠিত যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জন লোপ পেত এবং সেই লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হত। যেমন – ‘পবত’ থেকে হল ‘পবত’ এবং তার পরবর্তী রূপ হল ‘পাবত’।

২) এই যুগের বাংলা ভাষায় নাসিক্য ব্যঞ্জন অনেক সময় লোপ পেত এবং তার প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে যেত। যেমন, ‘শব্দেন’ হল ‘সাদেঁ’।

৩) পদের অন্তে একাধিক একক স্বরধ্বনি থাকলে, ক্রমশ দুটি মিলে একটি একক স্বরে পরিণত হত। যেমন, ‘পুস্তিকা’ থেকে রূপান্তরের পথ ধরে ‘পোথিআ’ থেকে ‘পোথী’ হল।

৪) দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকলে, উচ্চারণের দ্রুততায় প্রায়ই এই যুগের বাংলা ভাষায় তাদের মাঝে ‘য়’ ধ্বনি শ্রুতিধ্বনি রূপে এসে বসত। যেমন, নিকটে-নিঅড্ডী-নিয়ড্ডী-নিয়ডি – এখানে ‘য়’ শ্রুতিধ্বনি রূপে এসে বসে গেছে।

৫) স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রায়ই হ’-কারে পরিণত হত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ‘মহাসুখ’ পরিণত হল ‘মহাসুহ’-তে।

৬) ‘শ’-এর স্থানে ‘স’-এর ব্যবহার প্রায়শই দেখা যেত। যেমন, পাটের আস (‘আশা’)

প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল এরকম –

১) কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি ছিল প্রাচীন বাংলা ভাষার অন্যতম ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

যেমন – ‘চঞ্চল চীএ পইচৌ কাল’ – এখানে কর্তৃকারকের শূন্য বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়।

২) এই সময় থেকে গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারকের রূপ একরকম হতে থাকে এবং গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারকে ক/কে/রে বিভক্তি বা শূন্য বিভক্তি পাওয়া যায়। মুখ্যকর্মে শূন্য বিভক্তির প্রয়োগ ঘটত।

৩) এই যুগে করণ কারকের বহু প্রচলিত বিভক্তি ছিল – এঁ। যেমন, ‘মতিএঁ ঠাকুরক পরিণিবিভা’ – এই বাক্যে করণ কারকে ‘এঁ’ বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়। করণ কারক ও অধিকরণ কারক প্রায় একরকম হয়ে যাওয়ায়, অধিকরণ কারকের ক্ষেত্রেও এই একই বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তবে এছাড়াও অধিকরণের কিছু

নিজস্ব বিভক্তি ছিল – ই, এ, হি, তেঁ, ত। অধিকরণের বিভক্তিগুলির মধ্যে ‘এ’ বিভক্তির বাড়াবাড়ি রকম প্রয়োগ দেখা যেত। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল এই বাক্যটি – ‘জামে কাম কি কামে জাম’, এখানে অধিকরণ কারকে ‘এ’ বিভক্তির প্রয়োগ হচ্ছে।

৪) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি ছিল এর, র, ক। যথা, ‘রুখের তেত্তলি কুস্তীরে খাত’।

৫) তির্যক বিভক্তি ছাড়াও অপাদান কারকের নিজস্ব বিভক্তি ছিল হুঁ। যথা – ‘রঅণহুঁ’ (রত্নাং)

৬) প্রাচীন বাংলা ভাষার সময়কালেই প্রথম অনুসর্গের ব্যবহার শুরু হয়। যেমন, ‘তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী’ – এখানে ‘অন্তরে’ অনুসর্গের ব্যবহার হয়েছে।

৭) ক্রিয়ারূপে বর্তমান কালের বিভক্তি ছিল উত্তম পুরুষে মি, হুঁ, মধ্যম পুরুষে –স এবং প্রথম পুরুষে –ই। অতীতকালের ক্রিয়ারূপ গঠন হত নিষ্ঠান্ত পদ দিয়ে এবং ধাতুর সঙ্গে –ল বা –ইল প্রত্যয় যুক্ত করে। এবং ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ারূপ গঠিত হত –ইব যোগ করে।

ছন্দ-

প্রাচীন বাংলা ভাষার ছন্দোবীতিগত বৈশিষ্ট্য হল এই যে এসময় মূলত পাদাকুলক ছন্দেই কবিতা লেখা হত।

১.১.৬ সারাংশ

নব্য ভারতীয় আর্থভাষার জন্ম হল ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর সেই বাংলা ভাষায় প্রায় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ধরে মানুষ রচনা করল সাহিত্যেও। এই ভাষার নামকরণ পণ্ডিতরা করেন প্রাচীন বাংলা ভাষা। সেই সময়ে রচিত সাহিত্যের প্রামাণ্য নিদর্শন মেলে চর্যাপদ গ্রন্থে। এটি ছিল সেই সময়কালে রচিত সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকদের লেখা একটি কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থ আবিষ্কার করেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে। ১৯১৬ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশরূপ লাভ করল। এখন এই চর্যাপদ যেহেতু প্রাচীন বাংলা ভাষায় লে

খা একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন, সুতরাং এর ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব হয়ে দাঁড়ায় অপরিসীম। এই গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করেই প্রধানত প্রাচীন বাংলার বেশ কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায়। যেমন, যুগ্মব্যঞ্জনের একটি ব্যঞ্জন লোপ পেলে, তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে তার আগের স্বরধ্বনিটি দীর্ঘ উচ্চারিত হত এবং নাসিক্যব্যঞ্জন লোপ পেলে তার আগে থাকা স্বরধ্বনিটি ‘নাকি’ উচ্চারিত হত। ‘শ’-এর স্থানে ‘স’-এর ব্যবহার হত। দুই স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকলে ‘য়’ ধ্বনি শ্রুতিধ্বনি হিসাবে এসে বসে যেত। একক মহাপ্রাণ ধ্বনি পরিণত হত ‘হ’ কারে। কর্তৃকারক ও মুখ্যকর্মে শূন্য বিভক্তি এবং গৌণকর্মে ও সম্প্রদান কারকে ক/কে/রে বিভক্তি বা শূন্য

বিভক্তির প্রয়োগ ঘটত। করণ কারকের বহু প্রচলিত বিভক্তি ছিল ঐ। সম্বন্ধ পদের বিভক্তি ছিল এর, র, ক। এই যুগে প্রধানত পাদাকুলক ছন্দেই কবিতা লেখা হত।

১.১.৭ তৃতীয় ভাগ – মধ্য বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

মধ্য বাংলা ভাষা –

প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার পরে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার আবির্ভাব হল। এর সময়সীমা ছিল মোটামুটি ভাবে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল। অর্থাৎ প্রায় ৪০০ বছর। এই ব্যাপ্ত সময়কালকে, ভাষার পরিবর্তনের চিহ্নের ওপর ভিত্তি করে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকেরা। আদিমধ্য বাংলা ভাষার যুগ ও অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার যুগ।

আদিমধ্য বাংলা ভাষার যুগের সময়সীমা ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে নাম করা যায় বড়ু চন্ডিদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য’-এর। এই সময়কার ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে এভাবে নির্দেশায়িত করা যায় –

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য –

- ১) আদিমধ্য বাংলা ভাষার প্রথম ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মধ্যে দ্বিতীয় ধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ, অথবা পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনি মিলিত হয়ে যৌগিক স্বরের সৃষ্টি হওয়া।
- ২) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবনে নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংযোগও এই যুগের অন্যতম ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল বলে মনে করা হয়। যেমন – ‘কান্তি’ থেকে ‘কাঁতি’।
- ৩) মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। যেমন – ‘হু’ থেকে ‘ন’।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য –

- ১) এই যুগের ভাষায় কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি দেখা যেত। নিচের বাক্যটি হল এর উদাহরণ – ‘শীতল মনোহর বাঁশি কে না বাএ’।
- ২) আদিমধ্যযুগে মুখ্য কর্মে কোনো বিভক্তি যুক্ত হত না। গৌণকর্মে ও সম্প্রদান কারকে ক, কে, রে বিভক্তি যুক্ত হত।

৩) অপাদান কারকের অর্থ প্রকাশের জন্য পঞ্চমী বিভক্তির বদলে 'হৈতে' অনুসর্গের সাহায্য নেওয়া হত। যথা, 'আজি হৈতে আক্ষার হৈলাহেঁ একমতী'।

৪) সম্বন্ধ পদের অর্থ প্রকাশের জন্য ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল এর, র, ক, কের। যেমন, 'চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক ভিতে'।

৫) অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন ছিল ত, তে, এ। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল এই বাক্যটি - 'মদনবাণে পরাণে আকুলী ল'।

৬) উত্তম পুরুষের সর্বনাম ছিল আক্ষে-মোঁ। মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ছিল তোঁ-তোক্ষে। এগুলির সঙ্গে বিভিন্ন কারকের বিভক্তি যুক্ত হওয়ার রেওয়াজ ছিল।

৭) আদি মধ্য যুগের বাংলা ভাষায় সর্বনাম পদের সঙ্গে কর্তৃকারকের বহুবচনে 'রা' বিভক্তি যুক্ত হত। এর উদাহরণ হল এই বাক্যটি - 'আজি হৈতে আক্ষার হৈলাহেঁ একমতী'।

৮) সেই যুগের বাংলা ভাষায় ধাতুর সঙ্গে ই, ইয়াঁ, ক, ইতেঁ, ইলে যুক্ত করে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপগঠনের রেওয়াজ ছিল।

যেমন - 'পাখি নহেঁ তার ঠাই উড়ি পড়ি জাঁও।/ মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ'।

ছন্দ -

আদিমধ্য যুগের ছন্দের ব্যাপারে বলতে গেলে প্রথমে চলে যেতে হবে প্রাচীন যুগে বা তারও আগে। অপভ্রংশের বিশিষ্ট ছন্দ পাদাকুলকের প্রতি পদে ষোলোটি করে মাত্রা থাকত। তার থেকে পরবর্তীতে চতুষ্পদী ছন্দের জন্ম হয়। পাদাকুলকের একমাত্রা ক্ষয় পেয়ে চতুষ্পদীর প্রতি পদে পনেরো মাত্রা হয়ে যায়। চর্যাপদের সময়ে এই পাদাকুলক চতুষ্পদী থেকে বাংলা পয়ার ছন্দের জন্ম হল। আদিমধ্য বাংলা ভাষার ছন্দোবীতিগত বৈশিষ্ট্য হল এই যে এসময় পয়ার ছন্দ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এছাড়াও নানা ধরনের ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহারও এ যুগের সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়।

অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার যুগের সময়সীমা ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে নাম করা যায় বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, চৈতন্য জীবনীসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল), অনুবাদ সাহিত্য (রামায়ণ, মহাভারত, ভগবতের বাংলা অনুবাদ), আরাকান রাজসভার সাহিত্য, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি সাহিত্যের। অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষা ছিল অনেক সমৃদ্ধ। এইসময় সাহিত্যের নানা শাখার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের বাংলা ভাষায় লেখা একাধিক সাহিত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, যার থেকে সে যুগের ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের কাজটি সম্ভবপর হয়েছে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য -

১) এই যুগের বাংলা ভাষায় কোনো পদের অন্তে একক ব্যঞ্জন অবস্থান করলে, তার পরে থাকা 'অ'-কার লোপ পেল। অথচ পদের অন্তে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে, তার পরের 'অ'-কার বিলুপ্ত হত না। আবার পদের অন্তে একক ব্যঞ্জনের পরে, 'অ'-কার ছাড়া অন্য কোনো স্বরধ্বনি থাকলে, সেগুলি রক্ষা পেল।

২) পদের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে অনেক সময় শব্দের মধ্যে থাকা স্বরধ্বনির লোপের প্রবণতা এই যুগের বাংলা ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন, 'হরিদ্রা' হয়ে যেত 'হল্দি'। তবে এই বৈশিষ্ট্যটি মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় তেমন ব্যাপক ভাবে দেখা যেত না।

৩) অপিনিহিতি হল সেই প্রক্রিয়া যেখানে শব্দমধ্যস্থ 'ই' বা 'উ' সেটি যে ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে আছে, তার আগে সরে এসে উচ্চারণ হয়। আর বিপর্যাস প্রক্রিয়ায় উচ্চারণের দ্রুততায় শব্দমধ্যস্থ দুটি ধ্বনি পরস্পরের মধ্যে স্থান বদল করে নেয়। এখন অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় অপিনিহিতি বা বিপর্যাস প্রক্রিয়ায় শব্দের মধ্যবর্তী 'ই' বা 'উ' কখনো কখনো তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আগে সরে আসত (যেমন - 'বেগুন' থেকে হল 'বেউগণ' ও তার থেকে 'বাইগণ')। আবার কখনো বিপর্যাস বা অপিনিহিতি প্রক্রিয়ায় আগে সরে আসা 'ই' বা 'উ' লোপও পেল। তবে এই বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক প্রয়োগ সর্বত্র পরিলক্ষিত হত এমন নয়।

৪) আদিমধ্য যুগের বাংলাতেই মহাপ্রাণ নাসিক্য অল্পপ্রাণ হতে আরম্ভ করেছিল। যেমন - 'আক্ষি' থেকে 'আমি' বা 'তোক্ষার' থেকে 'তোমার'। অন্ত্যমধ্য যুগে এই প্রবণতা আরো বেশি করে লক্ষ্য করা যেতে লাগল।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য -

১) আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় যেখানে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে 'রা' বিভক্তির প্রয়োগের সূচনা হয়েছিল, অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলায় সেখানে বিশেষ্য পদের কর্তৃকারকের বহুবচনেও এই 'রা' বিভক্তির প্রয়োগ করা হত। এছাড়া নির্দেশক ও অনির্দেশক বহুবচনে 'গুলি', 'গুলি' বিভক্তির প্রয়োগও হত। এর একটি আদর্শ উদাহরণ নিচে দেওয়া হল -

'কে বলে শারদ শশী ও মুখের তুলা।/ পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলি।।'

২) সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল 'র', 'এর'। এই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যাবে নিচের বাক্যটিতে -

'ক্লপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।/ যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।'

৩) সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন ছিল 'য়', 'এ', 'তে'। নিচের বাক্যটিতে এই বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় -

'উই চারা খাই বনে জাতিতে ভালুক।/ নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।।'

৪) অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় ক্রিয়ার বিভক্তি নিয়েও প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। সাধারণ সদ্য অতীত কালের প্রথম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি ছিল ইল, ইলা এবং উত্তম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি ছিল ইলাঙ, ইলাম।

তাছাড়া সাধারণ ভবিষ্যত কালের উত্তম পুরুষের বিভক্তি ছিল – ইব। এর উদাহরণ হল এই বাক্যটি – ‘সখীর উপরে দেহ তগুলের ভার।/ তোমার বদলে আমি করিব পসার।।’

৫) কিছু সংস্কৃত নামশব্দকে ক্রিয়ার ধাতুরূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করে নামধাতুর উদ্ভব হয়। অন্ত্যমধ্য যুগের সাহিত্যে নামধাতুর এই ব্যবহার বহু স্থানে দেখা যেত। এটা ছিল সে যুগের এক অন্যতম ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

৬) মধ্যযুগে বাংলার শব্দভান্ডারে বহু আরবী-ফারসী, তুর্কী শব্দ ও প্রত্যয় গ্রহণ করা হয়েছিল। তৎকালীন মুসলমান শাসকদের প্রভাবেই এইসব শব্দ বাংলা শব্দভান্ডারের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ছন্দ-

অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় ছন্দের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। পয়ার ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাছাড়াও বিভিন্ন ছাঁদের ত্রিপদী ছন্দও সাহিত্যে প্রযুক্ত হত। ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণব কবিতার প্রধান ছন্দ ছিল অপভ্রংশের চতুষ্পদী ছন্দ।

এই যুগের বাংলার একটি বিশেষ গুণ হল এই যে এসময় বাঙালি কবিরা বৈষ্ণব পদ রচনাকালে ব্রজবুলি ভাষা সৃষ্টি করে তার সাহায্যে সাহিত্য রচনা করত। এই ব্রজবুলি ভাষা হল মৈথিলী, অবহট্ট এবং বাংলা মিশ্রিত এক সাহিত্যিক ভাষা। তো সেই ব্রজবুলি ভাষাতে সাহিত্য রচনা এই অন্ত্যমধ্য যুগের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

১.১.৮ সারাংশ

মধ্যযুগের বাংলা ভাষাকে সময়পর্বের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আদিমধ্য বাংলা ভাষা ও অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষা। এই দুই যুগের বাংলা ভাষার মধ্যে ভাষাতত্ত্বের বিচারে ফারাক তৈরি হয়েছে। সেদিকে এবার দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

আদিমধ্যযুগের বাংলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থই হল একমাত্র প্রামাণ্য নিদর্শন। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে লেখা আর অন্য কোনো গ্রন্থের সন্ধান মেলেনি যেহেতু, তাই এই গ্রন্থের ভিত্তিতেই এই সময়ের বাংলা ভাষাকে চিনে নিতে হবে। এখন আদিমধ্য বাংলা ভাষায় পাশাপাশি দুটি ধ্বনি থাকলে দ্বিতীয়টির উচ্চারণ ক্ষীণ হত বা দুটি ধ্বনি মিলে যৌগিক স্বর হয়ে যেত। সংযুক্ত ব্যঞ্জননের সরলীভবন ও মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপও ছিল এ যুগের অন্যতম দুটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। এই যুগের বাংলা ভাষায় কর্তৃকারক ও মুখ্য কর্মে বিভক্তিহীনতা এবং গৌণকর্মে ও সম্প্রদান কারকে ক, কে, রে বিভক্তি যোগ হতে দেখা যেত। অপাদান কারকের অর্থপ্রকাশে ‘হৈতে’ অনুসর্গের ব্যবহার হত। ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল এর, র, ক, কের। উত্তম পুরুষের সর্বনাম ছিল আক্ষে-মোঁ। মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ছিল তোঁ-তোক্ষে। আদিমধ্য বাংলা ভাষার ছন্দোবীতিগত বৈশিষ্ট্য হল এই যে এসময় পয়ার ছন্দ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এছাড়াও নানা রকম ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছিল।

অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা ভাষায় ভাষাতাত্ত্বিক গঠনের ক্ষেত্রে আরো বেশ কিছু বদল চোখে পড়ে যায়। এইসময় পদের অন্ত্যে একক ব্যঞ্জনের পরে থাকা ‘অ’-কার লোপ পেরে। অথচ যুক্তব্যঞ্জনের পরে থাকা ‘অ’-কার অক্ষুণ্ণ থাকত। শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দমধ্যস্থ স্বরলোপের ঘটনা ঘটত। মহাপ্রাণ নাসিক্যের অল্পপ্রাণতা ও অপিনিহিত প্রক্রিয়ায় শব্দের মধ্যে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটাও অন্ত্যমধ্য বাংলার অন্যতম ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্বনাম ও বিশেষ্যপদের কর্তৃকারকের বহুবচনে ‘রা’ বিভক্তির প্রয়োগ এবং নির্দেশক ও অনির্দেশক বহুবচনে ‘গুলি’, ‘গুলি’ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যেতে লাগল। অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা ভাষায় ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন র, এর এবং সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন য়, এ, তে ছিল। এই সময়কালে নামধাতুর উদ্ভব হয় এবং বাংলার শব্দভান্ডারে বহু আরবী-ফারসী, তুর্কী শব্দ ও প্রত্যয় গৃহীত হয়ে বাংলা শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী ছন্দে কবিতা লেখার পাশাপাশি ব্রজবুলি ভাষার জন্মও এই যুগের অন্যতম বিশেষ দিক।

১.১.৯ চতুর্থ ভাগ – আধুনিক বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও উপভাষা

আধুনিক বাংলা ভাষা

মধ্য যুগের বাংলা ভাষার পরে বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের আবির্ভাব হল। এর সময়সীমা হল মোটামুটি ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান কাল। ১৭৬০ সালে মধ্যযুগের শেষ বড় কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর ঘটনাকে মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা বলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতারা ধরে নিয়েছেন। সুতরাং এরপর থেকে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য কিছু নতুন লক্ষণ নিয়ে আবির্ভূত হল, এ কথা ধরে নেওয়া যেতেই পারে।

এখন দেখে নেওয়া যাক আধুনিক বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল কি কি এবং কোথায়, কিভাবে তারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য –

১) মধ্যযুগ থেকেই মানুষের মুখের ভাষা ছিল পদ্যভাষা। কিন্তু আধুনিক যুগে প্রথম পদ্যভাষার সাথে গদ্যভাষাতেও সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হল।

২) সাহিত্যে যে গদ্য ভাষার ব্যবহার শুরু হল, তার আবার দুটি শাখার জন্ম হল, সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। মধ্যযুগের বাংলার খাঁচে যে সাহিত্য লেখা হত, তাকে সাধুভাষার পর্যায়ে রাখা যেতে পারে। আর পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও তার সন্নিকটস্থ অঞ্চলের লৌকিক কথ্য ভাষাই সাহিত্যে চলিত ভাষা রূপে পরিগণিত হল। এই দুই গদ্য, সাধু ও চলিত প্রায় সমসময়ে শুরু হলেও, ঊনবিংশ শতকের গদ্যে যেমন সাধুভাষার প্রয়োগ অধিক লক্ষ্য

করা যেত, তার পরবর্তীতে আবার চলিত ভাষার প্রয়োগ অধিক হয়ে ওঠে এবং বাংলা সাহিত্যে প্রধানত চলিত গদ্যই বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৩) আধুনিক যুগের বাংলা ভাষায় সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে - সাধুভাষায় ক্রিয়া, সর্বনাম, অনুসর্গের দীর্ঘরূপ বজায় থাকত, যেমন - করিয়া, বলিয়া, আমাদিগের, সহিত ইত্যাদি। চলিত ভাষার ক্ষেত্রে এর সংক্ষিপ্ততম রূপটির প্রকাশ লক্ষ্য করা যেত, যেমন - করে, বলে, যার, তার, সঙ্গে ইত্যাদি।

৪) মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ছিল অপিনিহিত বা বিপর্যাস প্রক্রিয়ায় শব্দের মধ্যবর্তী 'ই' বা 'উ' কখনো কখনো তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জননের আগে সরে আসত। আধুনিক বাংলা ভাষায় এর পরবর্তী প্রক্রিয়ায় অভিশ্রুতি সংঘটিত হত, যার ফলে অপিনিহিত 'ই' বা 'উ' পার্শ্ববর্তী স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও তার সঙ্গে মিশে পরিবর্তিত হয়ে যেত।

৫) শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি থাকা দুটি পৃথক স্বরধ্বনি একটি অন্যটিকে বা দুটি পরস্পরকে প্রভাবিত করে একই রকম বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই প্রক্রিয়াকে বলে স্বরসঙ্গতি।

এখন আধুনিক চলিত বাংলা ভাষায় শব্দের মধ্যে কাছাকাছি বা পাশাপাশি থাকা দুটি বিষম স্বরধ্বনির একই রকম বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে পরিণত হওয়ার এই স্বরসঙ্গতি প্রক্রিয়াটি প্রায়শই দেখা যেতে লাগল।

৬) ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার এই যুগের বাংলা ভাষায় শুরু হল। তবে প্রথমদিকে এর ব্যবহার সাধুভাষায় বেশি দেখা যেত। যেমন - গমন করা, চয়ন করা। পরবর্তীতে চলিত বাংলা ভাষায়ও এই যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার হতে শুরু করল। যেমন - গান করা, দান করা। আবার আরো পরের দিকে সাধুভাষার সরলীকরণের কারণে এই যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার কমতে থাকল।

৭) আধুনিক বাংলা ভাষায় দুটি সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার অধিক দেখা যায়, যেগুলি হল - 'ও', 'এবং'। এর মধ্যে 'এবং'-এর ব্যবহার পূর্ববর্তী কাল থেকেই চলে আসছিল। 'ও' হল আধুনিক বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। দুটি পদকে যুক্ত করতে সাধারণত এই 'ও'-এর ব্যবহার করা হত।

৮) আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার বাক্য-গঠনরীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল নঞর্থক অব্যয়, যথা - 'নি', 'না', 'নাই' ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে (যথা- 'সে লেখাপড়া না করে খেলতে যায় না') ও সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসত (যথা- 'সে কখনো বাবার কথার অন্যথা করেনি')। তবে কখনো কখনো এও দেখা যায় যে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগেও বসে থাকত। যেমন- 'রমা না বাজারে গেল, না মেলায় গেল, সারাদিন চুপ করে ঘরে বসে রইল'।

৯) যৌগিক বাক্য হল এমন বাক্য যেখানে সংযোজক অব্যয় দ্বারা একাধিক সরল বাক্যকে সংযুক্ত করা হয়। একটি যৌগিক বাক্যের উদাহরণ হল এটি - 'সে বাড়ি ফিরল ও খেতে বসল'। আধুনিক বাংলা ভাষার অন্যতম

বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার না করেই পূর্ববর্তী বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করেও দুটি বাক্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে একটি সরল বাক্য রচনা করা হত। এখন উপরোক্ত বাক্যটি আধুনিক ভাষায় এই রূপ নিল – ‘সে বাড়ি ফিরে খেতে বসল’।

১০) আধুনিক যুগের বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব গভীরতম। তার ফলে বাংলা ভাষায় বহু ইংরাজী শব্দ ঢুকে পড়েছে। যেমন – রেডিও, টেবিল, চেয়ার। শুধু ইংরাজী ভাষা নয়, পর্তুগীজ, ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান ভাষা থেকেও বহু শব্দের আমদানী বাংলা ভাষায় হতে থাকে। এর ফলে বাংলা শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়।

বাংলা ভাষার বিবর্তনের স্তরপর্যায় লক্ষ্য করলে আমরা দেখব, ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যখন আধুনিক বাংলা ভাষার সূত্রপাত, তার পরেও বিভিন্ন কারণে সেই ভাষাশরীরে কম-বেশী বদল এসেছে। উদ্ভব ঘটেছে নতুন স্তরের। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় উপভাষার কথা। আদর্শ বাংলা ভাষার ব্যবহার অঞ্চল বিশেষে মানুষ নিজের মতো করে করতে থাকলে, সেখান থেকেই জন্ম হয় উপভাষার। এই উপভাষার প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য অবশ্য মুখের ভাষার মধ্যেই ধরা পড়ত। কর্মক্ষেত্রে আদর্শ ভাষার ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গেলে বলা যায়, একই ভাষার মধ্যে যে আঞ্চলিক পার্থক্য, একেই আঞ্চলিক উপভাষা বলা হয়।

বাংলা ভাষার প্রধান উপভাষার সংখ্যা ছিল পাঁচটি। রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খন্ডী, কামরূপী বা রাজবংশী। পৃথক অঞ্চলভেদে এগুলির ব্যবহার লক্ষ্য করা যেত। যেমন, রাঢ়ী বাংলা ভাষার ব্যবহার ছিল বীরভূম, বর্ধমান, কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে। বঙ্গালী উপভাষার ব্যবহার ছিল ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে। বরেন্দ্রী ভাষার প্রয়োগ ঘটত উত্তরবঙ্গের মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে। ঝাড়খন্ডী ভাষায় কথা বলত মানভূম, সিংভূম, ধলভূম প্রভৃতি স্থানের মানুষ। রাজবংশী ভাষা প্রচলিত ছিল জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে। আধুনিক বাংলা ভাষার অন্তর্গত এই পাঁচটি উপভাষার ছিল এমন বিশেষ-বিশেষ রূপ, যা ছিল এক একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত এবং এই উপভাষাগুলির সাথে আদর্শ বাংলা ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য সৃষ্টি হত। শুধু অঞ্চলভেদেই নয়, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ওপর ভিত্তি করেও বাংলা ভাষার শ্রেণিবিভাগ করা যায়। একে ‘সামাজিক উপভাষা’ শিরোনামে নামাঙ্কিত করা যায়।

তবে শুধু উপভাষাই বাংলা ভাষার বিবর্তনের অন্তিম স্তর নয়। উপভাষার পরে সৃষ্টি হল বিভাষার। এক একটি উপভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য অনুযায়ী যে স্বতন্ত্র রূপের গঠন হয়, তাকেই বিভাষা বলে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে রাঢ়ী ও বঙ্গালী উপভাষার বিস্তার যেহেতু বেশি, তাই মধ্যেও একাধিক বিভাষার জন্ম হয়েছে। শুধুমাত্র রাঢ়ী ভাষারই চারটি উপবিভাগ আছে, ক) পূর্ব-মধ্য খ) পশ্চিম মধ্য গ) উত্তর-মধ্য ঘ) দক্ষিণ-মধ্য। এভাবেই সব উপভাষার মধ্যে কিছু শ্রেণি গড়ে উঠেছে তাদের স্থানিক ভাষাগত বৈচিত্রের ওপর ভিত্তি করে।

সবশেষে বলা যায় যে এভাবেই একই ভাষার মধ্যে নানা স্তর ও পর্যায়ে পার্থক্য থাকে। এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার রূপ ক্রমশ জটিল ও বিচিত্র হতে থাকে। এভাবেই কোনো ভাষা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় ও সমৃদ্ধ হতে থাকে।

১.১.১০ সারাংশ

১৭৬০ সালে মধ্যযুগের শেষ বড় কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর ঘটনাকে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার সূচনা বলে বাংলা সাহিত্যিক এবং ভাষাবিদ্রা ধরে নিয়েছেন। সুতরাং ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরের সময়ের ভাষাকে আধুনিক বাংলা ভাষা বলা হয়। এই ভাষার নিজস্ব কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল, যেগুলি একে মধ্যযুগের বাংলা থেকে আলাদা করে দেয়। সেগুলি হল এরকম – আধুনিক যুগে পদ্যভাষার পাশাপাশি গদ্যভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হল। সাহিত্যে সাধুভাষার পাশাপাশি মানুষের মুখের ভাষা অর্থাৎ চলিত ভাষার প্রচলন দেখা দিতে লাগল। সাধুভাষায় ক্রিয়া, সর্বনাম, অনুসর্গের দীর্ঘরূপ ও চলিত ভাষায় এর সংক্ষিপ্ত রূপটি গৃহীত হল। ধ্বনি পরিবর্তনের দুটি প্রক্রিয়া অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি এই আধুনিক যুগের ভাষাতেই লক্ষিত হতে থাকল। যৌগিক ক্রিয়া ও ‘ও’ – এই সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার বাংলা ভাষায় দেখা দিল। বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ, ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান ভাষা থেকে আগত নতুন নতুন শব্দের ব্যবহার হতে থাকল, যার ফলে বাংলা শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হল। তাছাড়াও এই যুগের বাংলা ভাষায় অঞ্চলভেদে বৈচিত্র্য দেখা দিতে থাকায় উপভাষাগুলির জন্ম হল। সংক্ষেপে এটাই হল আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য।

১.১.১১ নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

রামেশ্বর শ – সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

অনুশীলনী – ১

১) নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরে টিক() চিহ্ন দিন। উত্তর করা হয়ে গেলে নিচে দেওয়া উত্তর সংকেত দেখে মিলিয়ে নিন।

ক) সারা পৃথিবীর ভাষাগুলিকে মোট কয়টি ভাষা বংশে ভাগ করে নেওয়া হয় –

১) ১২টি

২) ১৫টি

৩) ৯টি

খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুটি রূপ ছিল -

১) আদি ও সমাপ্ত রূপ

২) ভারতীয় ও বহির্দেশীয় রূপ

৩) কথ্যরূপ ও সাহিত্যিক রূপ

গ) প্রাচীন বাংলায় সমব্যঞ্জে গঠিত যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জন লোপ পেলো -

১) সেই লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হত

২) সেই লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হত

৩) সেই লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন দীর্ঘ উচ্চারিত হত।

ঘ) প্রাচীন বাংলা ভাষায় কর্তৃকারকের বিভক্তি ছিল -

১) শূন্য বিভক্তি

২) ক, কে, রে বিভক্তি

৩) ঐ বিভক্তি

ঙ) আদিমধ্য বাংলা ভাষার যুগের সময়সীমা ছিল -

১) ১২০০-১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ

২) ১৭৬০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ

৩) ১৩৫০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ

চ) অপিনিহিত ও বিপর্যাস প্রক্রিয়া কোন যুগের বাংলা ভাষায় বেশি দেখতে পাওয়া যায় -

১) প্রাচীন যুগ

২) আদিমধ্য যুগ

৩) অন্ত্যমধ্য যুগ

ছ) মধ্যযুগে বাংলার শব্দভান্ডারে বহু আরবী-ফারসী, তুর্কী শব্দ ও প্রত্যয় গ্রহণ করা হয়েছিল

১) ইরানীয় আর্যভাষার প্রভাবে

২) সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে

৩) তৎকালীন সুলতানী শাসকদের প্রভাবে

জ) আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় নির্দেশক ও অনির্দেশক বহুবচনে কোন বিভক্তিগুলির প্রয়োগ ঘটত –

১) ক, কে, রে বিভক্তি

২) ‘গুলি’, ‘গুলি’ বিভক্তি

৩) শূন্যবিভক্তি

ঝ) ব্রজবুলি ভাষা হল

১) একটি হিন্দী ভাষা

২) মৈথিলী, অবহট্ট এবং বাংলা মিশ্রিত এক সাহিত্যিক ভাষা

৩) একটি বহির্দেশীয় ভাষা

ঞ) আধুনিক বাংলা ভাষায় দুটি সংযোজক অব্যয় হল –

১) ‘ও’, ‘এবং’

২) যথা ও তথা

৩) কিন্তু, কেন

২) নিচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।

ক) মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্য ভাষার যুগে কথ্যরূপটির ----- শাখা ছিল।

খ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগে বাংলা ছাড়াও -----, ----- প্রভৃতি ভাষার জন্ম হয়।

গ) প্রাচীন বাংলা ভাষায় তির্যক বিভক্তি ছাড়াও অপাদান কারকের নিজস্ব বিভক্তি ছিল -----।

ঘ) আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় ধাতুর সঙ্গে -ই, -ইয়াঁ, -ক, -ইতৈঁ, -ইলে যুক্ত করে -----
রূপগঠনের রেওয়াজ ছিল।

ঙ) ----- যুগের সাহিত্যে নামধাতুর ব্যবহার বহু স্থানে দেখা যেত।

চ) প্রাচীন বাংলা ভাষায় মূলত ----- ছন্দেই কবিতা লেখা হত।

ছ) আদিমধ্য বাংলায় অপাদান কারকের অর্থ প্রকাশের জন্য ----- ক্ষেত্রে 'হৈতে' অনুসর্গের সাহায্য নেওয়া হত।

জ) ১৭৬০ সালে মধ্যযুগে ----- মৃত্যুর ঘটনাকে মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা বলে ধরে নেওয়া হয়।

ঝ) গদ্য ভাষার দুটি শাখা হল ----- ও চলিত ভাষা।

ঞ) ----- উপভাষার ব্যবহার ছিল ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে।

৩) নিচের লেখা উত্তরগুলি পাঠ করে কোনটি শুদ্ধ ও কোনটি অশুদ্ধ তা নির্দিষ্ট শূন্যস্থানে লিখুন।

ক) ইন্দো ইউরোপীয় আর্য ভাষা আসলে বাংলা ভাষার জননী। -----

খ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে পরবর্তীকালে চারটি প্রাচীন ভাষা জন্ম নিয়েছিল। -----

গ) মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপ ছিল আধুনিক বাংলা ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। -----

ঘ) বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে প্রথম পদ্যভাষার সাথে গদ্যভাষাতেও সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হল। -----

ঙ) রাঢ়ী বাংলা ভাষার ব্যবহার ছিল উত্তরবঙ্গের মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে। -----

চ) অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা ভাষায় ব্রজবুলিতে বৈষ্ণব পদ রচিত হত। -----

ছ) প্রাচীন বাংলা ভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী স্থানে 'য়' ধ্বনি শ্রুতিধ্বনি রূপে এসে বসে যেত। -----

--

১) ক) ১

খ) ৩

গ) ২

ঘ) ১

ঙ) ৩

চ) ৩

ছ) ৩

জ) ২

ঝ) ২

ঞ) ১

২)

ক) চারটি

খ) কাশ্মীরী/সিন্ধী/পঞ্জাবী/মারাঠী/গুজরাটী/অসমীয়া/মণিপুরী/রাজস্থানী/ওড়িয়া ইত্যাদি

যে কোনো দুটি ভারতীয় ভাষা

গ) -হুঁ

ঘ) অসমাপিকা ত্রিয়ার

ঙ) অন্ত্যমধ্য

চ) পাদাকুলক ছ) পঞ্চমী বিভক্তির জ) কবি ভারতচন্দ্রের ঝ) সাধু ভাষা ঞ) বঙ্গালী

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

৩) ক) শুদ্ধ খ) অশুদ্ধ গ) অশুদ্ধ ঘ) শুদ্ধ ঙ) অশুদ্ধ চ) শুদ্ধ ছ) শুদ্ধ



ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ব্লক – ১ একক-২ - স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থান ও প্রকৃতি

BL-1 UNIT-2

গঠন

১.২.১ উদ্দেশ্য

১.২.২ প্রস্তাবনা

১.২.৩ ধ্বনি ও বর্ণের প্রাথমিক পরিচয় প্রদান

১.২.৪ স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ

১.২.৫ ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ

১.২.৬ সারাংশ

১.২.৭ নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

১.২.৮ উত্তর-সংকেত

১.২.১ উদ্দেশ্য –

এই এককটি পাঠ করলে ধ্বনি, বর্ণ ও ভাষার গঠন সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে। বাংলা ধ্বনির বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনির উচ্চারণ কিভাবে হয় সে দিকটি সম্পর্কে মূলগত ধারণা লাভ করা যাবে।

১.২.২ প্রস্তাবনা –

ভাষা মানবমনের ভাবপ্রকাশের সহায়ক। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হল ধ্বনি। ভাষা হল অসংখ্য ধ্বনির সমাহার। সুতরাং ধ্বনির পর্যবেক্ষণ ও তার বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াপদ্ধতিও তাই বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। এখন ধ্বনির খোঁজ করতে গেলে দৃষ্টি দিতে হবে বাংলা বর্ণমালার প্রতি। এই

বাংলা বর্ণমালা এসেছে সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে। তাই সংস্কৃত বর্ণমালার আদলে বাংলা বর্ণমালাতেও ধ্বনিগুলির বিজ্ঞানসম্মত পরিচয় রয়েছে। এ সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় – ‘সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ’ এবং ডঃ রামেশ্বর শ-এর ‘ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা’ গ্রন্থটিকে কেন্দ্রে রেখে। এই আলোচনা থেকে জানতে পারা যাবে যে বাংলা ধ্বনিসমূহের উচ্চারণের এক নিজস্ব ছন্দ ও বিজ্ঞান রয়েছে।

১.২.৩ ধ্বনি ও বর্ণের প্রাথমিক পরিচয় প্রদান

মানুষ যখন কোন ভাষায় কথা বলে, তখন আসলে তারা কিছু ধ্বনি নিয়ে খেলা করতে থাকে। এখন ধ্বনি কি, এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে দেওয়া যায় এভাবে, বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ধ্বনি বলে। বাগ্যন্ত্র কি, এই প্রশ্নও খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে এসে যায়। বাগ্যন্ত্র হল কথা বলার যন্ত্র। মানুষের বাগ্যন্ত্র অন্যান্য প্রাণীর থেকে আলাদা। এই বাগ্যন্ত্র গঠিত হয় চোয়াল, ঠোঁট বা ওষ্ঠ, দাঁত, জিভ বা জিহ্বা, আলজিভ, অতিজিহ্বা, কণ্ঠ, নাসিকা, তালু প্রভৃতির সাহায্যে। এই বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থযুক্ত ধ্বনির সমষ্টিকে শব্দ বলে। এই শব্দের সমষ্টি যখন কোনো বিশেষ জনসমাজ কর্তৃক মনের ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার হয়, তখন তাকে ভাষা বলে। সুতরাং ধ্বনির ব্যাপারে বলতে গেলে এভাবেও বলা যায় যে ধ্বনি হল ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। ধ্বনির লিখিত রূপকেই আবার বর্ণ বলে।

ধ্বনি বা বর্ণ মূলত দুই প্রকার হয়। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। সহজ ভাবে এদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় এভাবে –

স্বরধ্বনি – যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট রূপে উচ্চারিত হতে পারে, তাকেই বলে স্বরধ্বনি। যে সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা স্বরধ্বনিকে নির্দেশ করা যায় তাকে স্বরবর্ণ বলে। এর উদাহরণ হল – অ, এ, ই, উ প্রভৃতি।

ব্যঞ্জনধ্বনি – যে ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া সুস্পষ্ট রূপে উচ্চারিত হতে পারে না, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যে সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা ব্যঞ্জনধ্বনি লিখিত রূপ লাভ করে, তাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। যেমন – ক, চ, ছ, স, র প্রভৃতি।

বাংলা ভাষার প্রচলিত বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংখ্যা মোট ১১টি। যেমন – অ, এ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, ঍, ও, ঔ।

ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা সেখানে ৩৬টি। যথা – ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ঙ, ঙ, য়।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে খাঁটি বাঙলা উচ্চারণ ধরে বিচার করলে বাংলাতে শুদ্ধ স্বরধ্বনির সংখ্যা সাতটি। যথা – অ, আ, অ্যা, ই, উ, এ, ও। এবং বাংলা বর্ণমালার মধ্যে ৩৬টি ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে তিনটি চিহ্ন থাকে – ং, ঃ, ঁ। এর মধ্যে ‘ং’ – অনুস্বার ও ‘ঃ’ – বিসর্গ এই দুটি বর্ণের ব্যঞ্জন ও স্বরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই বলে এরা অযোগ্য। অথচ অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরা শব্দের যথার্থ রূপ ও অর্থকে বহন করে বলে এরা বাহ। এই দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য ‘ং’ ও ‘ঃ’ – কে অযোগ্যবাহ বর্ণ বলা হয়। এদের কথা এখানে আলাদা ভাবে বলে রাখা হল। এছাড়া বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় রয়েছে ‘ৎ’। একে বলে ‘খণ্ড ত’। বাংলাতে শুদ্ধ ব্যঞ্জনধ্বনি ‘ত’ বোঝাবার জন্য এই পৃথক চিহ্নটি (ৎ) ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এখন স্বরধ্বনির ও ব্যঞ্জনধ্বনির আরো দুটি প্রচলিত সংজ্ঞা তাদের উচ্চারণের প্রকৃতি অনুসারে প্রদান করা যেতে পারে। সেগুলি হল এরকম –

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখগহ্বর মধ্যস্থ শ্বাসবায়ু মুখবিবরের মধ্যে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তাকে বলে স্বরধ্বনি।

যে ধ্বনি উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু মুখগহ্বরের মধ্যে কোন না কোন স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নির্গত হয়, তাকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি।

বাংলা বর্ণমালার এই স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে নানা সূচক বা মানদণ্ডের অনুসারে বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করার এক প্রবণতা দেখা যায়। এই শ্রেণীবিভাগের নানা মানদণ্ড হয়। কখনো তা হয়ে থাকে উচ্চারণের সময়, স্থান বা প্রকৃতি অনুসারে। কখনো বা অন্য কিছু দ্বারা তাদের চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এবার আমরা সেদিকেই আলোকপাত দেব।

প্রথমে আলোচনা করে নেওয়া যাক স্বরধ্বনির কথা।

১.২.৪ স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ

বাংলা বর্ণমালার এগারোটি স্বরবর্ণের মধ্যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী আবার দুটি ভাগ করা যায়। হ্রস্ব স্বর, অর্থাৎ যে স্বর উচ্চারণে কম সময় লাগে, যেমন – অ, ই, উ, ঋ। এবং দীর্ঘ স্বর, অর্থাৎ যে স্বরের উচ্চারণে বেশি সময় লাগে, যেমন – আ, এ, ঊ প্রভৃতি। এই হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর ছাড়াও আর এক প্রকার স্বরধ্বনি আছে যার কথা এখানে বলে নেওয়া যায়, সেটি হল প্লুতস্বর। গান, আবৃত্তি বা রোদনের সময় হ্রস্ব-দীর্ঘ নির্বিশেষে কোন স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘতর হলে সেই স্বরটিকে প্লুতস্বর বলা হয়।

উচ্চারণ স্থানের বিচারে, সংস্কৃত ব্যাকরণের মত অনুযায়ী, বাংলা স্বরবর্ণের এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে –

‘অ, আ’ – এই স্বরবর্ণের উচ্চারণের সময় কণ্ঠের ব্যবহার প্রধান হওয়ায় এদের বলা হয় কণ্ঠবর্ণ।

‘ই ও ঈ’ – এর উচ্চারণ স্থান তালু বলে এদের বলা হয় তালব্যবর্ণ।

‘উ ও ঊ’ – এর উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ বলে এদের বলা হয়ে থাকে ওষ্ঠ্যবর্ণ।

‘ঋ’ – এর উচ্চারণ স্থান মূর্ধা বলে একে মূর্ধন্য বর্ণ বলে।

‘এ ও ঐ’ – এর উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু বলে এদের কণ্ঠতালব্য বর্ণ বলা হয়।

‘ও এবং ঐ’ – এর উচ্চারণের সময় কণ্ঠ ও ওষ্ঠ বেশি ব্যবহৃত হয় বলে এদের কণ্ঠ্যোষ্ঠ বর্ণ বলে।

স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বার অবস্থান অনুসারে স্বরধ্বনিগুলিকে এভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে –

সম্মুখ স্বরধ্বনি

পশ্চাৎ স্বরধ্বনি

কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি

উচ্চ স্বরধ্বনি

নিম্ন স্বরধ্বনি

উচ্চ-মধ্য বা মধ্যোচ্চ স্বরধ্বনি

নিম্ন-মধ্য বা মধ্যনিম্ন স্বরধ্বনি।

এবার সংক্ষেপে এগুলির পরিচয় জেনে নেওয়া যাক।

ই, এ, অ্যা – এই তিনটি স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিভ মুখবিবরের সামনের দিকে এগিয়ে আসে বলে, এদের সম্মুখ স্বরধ্বনি বলা হয়। অ, ও, উ – এই তিনটি স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিভ মুখবিবরের পেছন দিকে থাকে বলে এদের পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলা হয়। ‘আ’ ধ্বনি উচ্চারণকালে জিভের অবস্থান মুখবিবরের কেন্দ্রে থাকে বলে এই স্বরধ্বনিকে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি বলে। ই এবং উ – উচ্চারণকালে জিভ মুখবিবরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে থাকে বলে তাদের উচ্চ স্বরধ্বনি বলে। আ – উচ্চারণকালে জিভ মুখবিবরের একেবারে নিচে থাকে বলে একে নিম্ন স্বরধ্বনি বলে। এ, ও – উচ্চ স্বরধ্বনির উচ্চারণ-বিন্দু থেকে জিভকে মুখবিবরের মধ্যে কিছুটা নিচে নামিয়ে এনে এই স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয় বলে এদের উচ্চ-মধ্য বা মধ্যোচ্চ স্বরধ্বনি বলে। অ, অ্যা – নিম্ন স্বরধ্বনির উচ্চারণ-বিন্দু থেকে কিছুটা উপরে মুখবিবরের মধ্যে জিভকে নিয়ে গিয়ে এই স্বরধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ করা হয় বলে, এদের নিম্ন-মধ্য বা মধ্যনিম্ন স্বরধ্বনি বলে।

মুখবিবরের মধ্যে কতটা শূন্যস্থান রয়েছে তার ভিত্তিতেও স্বরধ্বনিগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যেমন –

সংবৃত স্বরধ্বনি

বিবৃত স্বরধ্বনি

অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি

অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি

এবারে সংক্ষেপে এই জাতীয় স্বরধ্বনির পরিচয় নিয়ে নেওয়া যাক।

ই, উ – এই স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণকালে অধর ও ওষ্ঠের মধ্যে ফাঁক প্রায় থাকে না বললেই হয়, তাই এদের সংবৃত স্বরধ্বনি বলা হয়ে থাকে। আ – হল এমন এক স্বরধ্বনি, যা উচ্চারণের সময় অধর ও ওষ্ঠের মধ্যে ফাঁক থাকে সর্বাধিক। তাই একে বিবৃত স্বর বলা হয়ে থাকে। এ, ও – এদের উচ্চারণের সময় সংবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান থেকে বিবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান পর্যন্ত যে শূন্যস্থান, জিভ আর নিচের চোয়াল দিয়ে তার দুই-তৃতীয়াংশই ভরে থাকে। এই বিশেষ অবস্থায় উচ্চারণ হয় বলেই এদের অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি বলে। অ্যা, অ – এদের উচ্চারণের সময়, সংবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান থেকে বিবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান পর্যন্ত যে শূন্যস্থান, জিভ আর

নিচের চোয়াল দিয়ে তার দুই-তৃতীয়াংশই ভরে থাকার সময়, উপরের দুই-তৃতীয়াংশ স্থান ফাঁকা থাকে। এই অবস্থা থেকে উচ্চারিত স্বরধ্বনিকেই অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি বলে।

ওষ্ঠ বা ঠোঁটের আকৃতি অনুসারেও স্বরধ্বনির তিনটি শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। যথা -

প্রসারিত স্বরধ্বনি

কুঞ্চিত স্বরধ্বনি

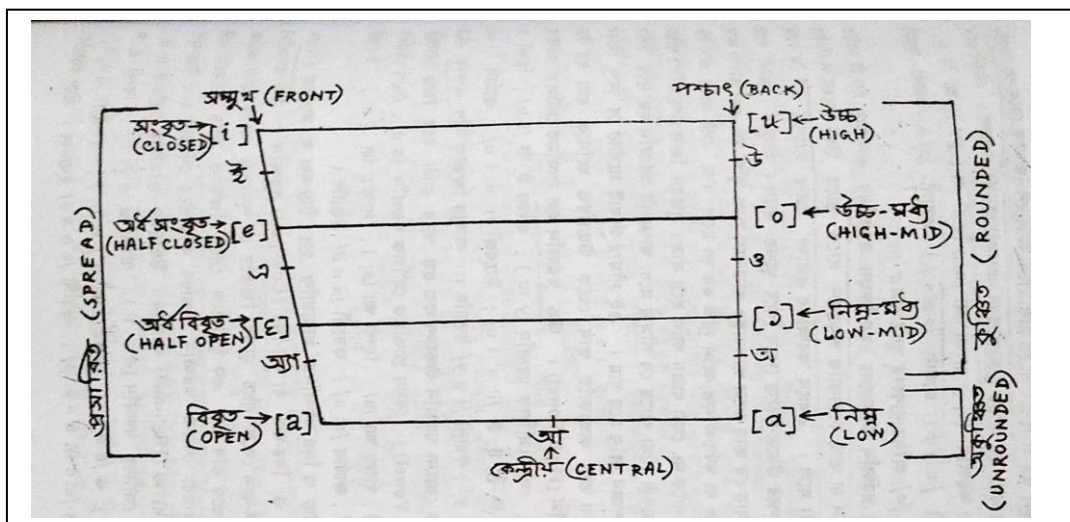
স্বাভাবিক বা মধ্যস্থ স্বরধ্বনি

এদের বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে এভাবে -

ওষ্ঠকে দু'দিকে (অর্থাৎ দুই কানের দিকে) প্রসারিত করে যে স্বরধ্বনির উচ্চারণ করা হয়, তাকে প্রসারিত স্বরধ্বনি বলে। যেমন - ই, এ, অ্যা। কিন্তু ওষ্ঠ যদি দু'দিকে প্রসারিত না হয়ে ফুঁ দেওয়ার মতো গোল হয়ে কুঞ্চিত আকার ধারণ করে তবে সেই অবস্থায় যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে কুঞ্চিত স্বরধ্বনি বলে। যেমন - অ, ও, উ। কোন কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ প্রসারিত বা কুঞ্চিত হয় না, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। এই রকম স্বরধ্বনিকে স্বাভাবিক বা মধ্যস্থ বা অকুঞ্চিত স্বরধ্বনি বলে। এই রকম স্বরধ্বনির উদাহরণ হল - আ।

উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও শ্বাসবায়ুর গতিপথ অনুসারে স্বরধ্বনিকে আরো দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল মৌখিক ও অনুনাসিক স্বরধ্বনি। স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু শুধু মুখ দিয়ে যাতায়াত করলে স্বরধ্বনি মৌখিক হয়। আর শ্বাসবায়ু একই সঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে যাতায়াত করলে স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়।

নীচে ডঃ রামেশ্বর শ-এর 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থের একটি ছকচিত্রকে সামনে রেখে স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ ও তার বৈচিত্র্যের কথা বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়াস করা হল -



১.২.৫ ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ

ব্যঞ্জনধ্বনির অতি সংক্ষিপ্ত যে পরিচয় পূর্বে প্রদান করা হয়েছে, সেটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে ভোকাল কড বা স্বরতন্ত্রীতে, মুখবিবরের মধ্যে বা তার সংলগ্ন কোন স্থানে যে কোন প্রকার বাধা উৎপন্ন হলে যদি কোন ধ্বনির সৃষ্টি হয় তবে সেই বাধাজনিত উৎপন্ন ধ্বনিকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

এখন এই শ্বাসবায়ু যে যে স্থানে বাধা পায়, সেই-সেই স্থানকে উচ্চারণ-স্থান বলে। শ্বাসবায়ুর গতিপথ ও তাতে বাধা আবার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। কখনো বাইরে থেকে শ্বাসবায়ু ভিতরে যায় কখনো ভিতর থেকে বাইরে আসে, কখনো শ্বাসবায়ুতে বাধা আংশিক হয়, কখনো পূর্ণ হয়, কখনো সামনের দিক থেকে বাধা সৃষ্টি হয়, দু'পাশ দিয়ে বায়ু বেরিয়ে যায়, কখনো এই শ্বাসবায়ুকে বাধা দিতে গিয়ে জিহ্বাতে কম্পন সৃষ্টি হয়, কখনো বা একবার বাধা দিয়ে জিহ্বা সরে যায় – বাধার এইসব নানা ধরনকে বলে উচ্চারণ-প্রকৃতি।

ব্যঞ্জনধ্বনির যে উচ্চারণ-বৈচিত্র্য, সেটি মূলতঃ নির্ভর করে এই উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-প্রকৃতি – এই দুইয়ের ওপরেই। সুতরাং ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগের দুটি মানদণ্ড হল –

ক) উচ্চারণ-স্থান

খ) উচ্চারণ-প্রকৃতি

এবারে আমরা ব্যঞ্জনধ্বনির এই শ্রেণীবিভাগকে প্রত্যক্ষ করব।

ক) উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ –

উচ্চারণ-স্থানের ওপর নির্ভর করে ব্যঞ্জনধ্বনির যে শ্রেণীবিভাগগুলি হতে পারে সেগুলি হল নিম্নরূপ –

ওষ্ঠ্য ধ্বনি – নীচের ওষ্ঠ দ্বারা ওপরের ওষ্ঠে বা দন্তে শ্বাসবায়ু বাধাপ্রাপ্ত হলে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে ওষ্ঠ্য ধ্বনি বলে। এর আবার দুটি রকমফের আছে। যেমন, বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ধ্বনি ও দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি। নীচের ওষ্ঠ ও উপরের ওষ্ঠ শ্বাসবায়ুর গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে যে ধ্বনি

উচ্চারণ করে তাকে বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ধ্বনি বলে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্ ধ্বনির কথা। নীচের ওষ্ঠ উপরের দাঁতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে তাকে দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনি বলে। এই দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনি বাংলায় পাওয়া যায় না। ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী ভাষার কিছু ধ্বনি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দন্ত্য ধ্বনি - জিহ্বাশিখর বা জিহ্বাপ্রান্ত উপরের দাঁতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে দন্ত্য ধ্বনি বলে। এর আরো দুটি নাম আছে, জিহ্বাপ্রান্তীয়-দন্ত্য ও জিহ্বাশিখরীয়-দন্ত্য ধ্বনি। বাংলা ভাষায় এর উদাহরণ হল ত্, থ্, দ্, ধ্।

দন্তমূলীয় ধ্বনি - জিহ্বাশিখর বা জিহ্বাপ্রান্ত দন্তমূলে শ্বাসবায়ুকে বাধা দেওয়ার ফলে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় সেই ধ্বনিকে দন্তমূলীয় ধ্বনি বলে। যেমন, র্, ল্, ন্।

প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বা মূর্ধন্য ধ্বনি - জিহ্বার সম্মুখ-প্রান্ত অর্থাৎ জিহ্বাশিখর শক্ততালুতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে সাধারণত প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বলা হয়। - এর অর্থ পেছন দিকে বেঁকে যাওয়া। এখন এই ধ্বনি উচ্চারণ কালে জিহ্বার অগ্রভাগ গোল হয়ে বেঁকে যায় এবং জিহ্বার সম্মুখ-প্রান্ত উপরে উঠে পিছন দিকে অর্থাৎ গলার দিকে ঘুরে যায় বলে একে Retroflex or Inverted ধ্বনি বলে। বাংলায় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বা মূর্ধন্য ধ্বনির উদাহরণ হল ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ঙ্, ঞ্ ধ্বনি।

তালুদন্তমূলীয় ধ্বনি - সম্মুখ-জিহ্বার পাতলা অংশ যখন শক্ততালু ও দন্তমূল দুইই স্পর্শ করে অথবা দুইয়ের সংযোগস্থলকে স্পর্শ করে তখন যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকেই বলে তালুদন্তমূলীয় ধ্বনি। বাংলা বর্ণমালায় এরকম ধ্বনি হল এগুলি - চ্, ছ্, জ্, ঝ্, শ্, য়্।

তালব্য ধ্বনি - জিহ্বার সম্মুখ-ভাগ যখন শক্ততালুতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে কোন ধ্বনি সৃষ্টি করে তখন সেই ধ্বনিকে তালব্য ধ্বনি বা সম্মুখজিহ্ব-তালব্য ধ্বনি বলে। সংস্কৃত, ইংরেজী, জার্মান ভাষায় এই জাতীয় ধ্বনির উদাহরণ থাকলেও, বাংলায় এই ধ্বনি পাওয়া যায় না।

ম্লিষ্টতালব্য/ কণ্ঠ্য ধ্বনি - জিহ্বার পশ্চাৎ-ভাগ দিয়ে দু'প্রকার ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে থাকে। ম্লিষ্টতালব্য ও অলিজিহ্ব। জিহ্বার পশ্চাৎ-ভাগ তালুর পশ্চাৎ-দিকের নরম অংশ বা ম্লিষ্টতালুতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে ম্লিষ্টতালব্য ধ্বনি বলে। যেমন, ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্।

অলিজিহ্ব ধ্বনি - জিহ্বার পশ্চাৎ-ভাগের শেষ প্রান্তকে জিহ্বামূল বলে। এই জিহ্বামূল যখন ম্লিষ্টতালুর শেষ প্রান্তে থাকা অলিজিহ্বাতে বা আলজিভে শ্বাসবায়ুকে বাধা দেয় তখন যে ধ্বনি

উচ্চারিত হয় তাকে অলিজিহ্ব বা কণ্ঠমূলীয় ধ্বনি বলে। আরবী ভাষায় এই ধ্বনির নজির থাকলেও বাংলায় এই ধরনের ধ্বনির দেখা পাওয়া যায় না।

স্বরতন্ত্রী বা কণ্ঠনালীয় ধ্বনি - দুটি স্বরতন্ত্রী পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে মধ্যবর্তী স্বরপথকে সঙ্কীর্ণ করে বা ক্ষণকালের জন্য একেবারে রুদ্ধ করে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে স্বরপথের ধ্বনি বা কণ্ঠনালীয় ধ্বনি বলে। স্বরপথ সঙ্কীর্ণ করে আংশিক বাধা সৃষ্টি করলে উষ্ম ধ্বনি সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষায় এই প্রকার ধ্বনি হল হ্।

খ) উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ -

উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুসারে ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করতে গেলে সর্বপ্রথমেই ধ্বনির উচ্চারণে বায়ুপ্রবাহের দিকে লক্ষ্য রাখলে ধ্বনিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় - ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি ও ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি।

এখন ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহের গতিপথে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করা হয় তাকে ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি বলা হয়। বাংলা ভাষার সব স্বাভাবিক ধ্বনিই হল এই শ্রেণীর ধ্বনির অন্তর্গত।

এবারে আমরা বিশেষ ভাবে এই ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনির দিকটি ভালোভাবে বুঝে নিতে চেষ্টা করব। এটি প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত - প্রতিহত বা স্পর্শ ধ্বনি এবং প্রতিবাহিত বা প্রবাহী ধ্বনি। এই দুটি ভাগ-বিভাজন করা হয়েছে মূলত শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে বাধার মাত্রাভেদ অনুসারে। নীচের ওষ্ঠ, জিহ্বা ইত্যাদি নীচের উচ্চারণক এবং উপরের ওষ্ঠ উপরের দাঁত ইত্যাদি উপরের উচ্চারণক পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে অথবা স্বরতন্ত্রী দুটি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্বাসবায়ুর গতিপথে যদি ক্ষণকালের জন্য সম্পূর্ণ বাধা দেয় তাহলে বায়ুপ্রবাহ ক্ষণকালের জন্য সম্পূর্ণ থেমে যায়। এইভাবে বাধাপ্রাপ্তির ফলে উচ্চারিত ধ্বনিকে প্রতিহত ধ্বনি বলে। এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাধা সৃষ্টিকারী বাগ্যন্ত্র দুটি ক্ষণকালের জন্য হলেও পরস্পরকে স্পর্শ করে বলে এভাবে সৃষ্টি হওয়া ধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বা স্পৃষ্টধ্বনিও বলে। প্, ফ্, ব্, ভ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্ ইত্যাদি হল প্রতিহত ধ্বনির উদাহরণ।

এরপর পরিচয় করে নেওয়া যাক ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ জনিত দ্বিতীয় প্রকার ধ্বনি, অর্থাৎ প্রতিবাহিত, প্রবাহিত বা প্রবাহী ধ্বনির সঙ্গে। শ্বাসবায়ুর গতিপথে দুটি বাগ্যন্ত্র মিলিয়ে যে বাধার সৃষ্টি হয়, সেটি যদি সম্পূর্ণত বাধা না হয়ে অল্প একটু শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের জন্য

সংকীর্ণ পথ খোলা থেকে যায় অথবা বাধা সৃষ্টিকারী বাগ্‌যন্ত্র দুটি পরস্পরের কাছাকাছি এসে বাধাসৃষ্টি না করে শুধু বাধার ভাবটি সৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রায় বাধাহীন অবস্থার সৃষ্টি করে, তাহলে এই পরিস্থিতিতে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তার উচ্চারণ কিছুক্ষণ ধরে চলতেই থাকে। এইরকম ধ্বনিকে প্রবাহিত বা প্রবাহী ধ্বনি বলে। প্রতিহত ধ্বনি যেমন শুধু মৌখিক হয়, প্রবাহিত ধ্বনির ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা হয় না। এটি দু'রকম হয়, নাসিক্য ও মৌখিক।

নাসিক্য ধ্বনি – ফুসফুস থেকে যাতায়াতের পথে শ্বাসবায়ু মুখের কোন স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যখন নাসাপথে বেরিয়ে যায় এবং যাবার পথে নাসিক্যগহ্বরের দেওয়ালে ঘষা খেয়ে অনুনাসিক অনুরণন সৃষ্টি করে তখন সৃষ্টিপ্রাপ্ত ধ্বনিকে বলে নাসিক্য ধ্বনি। বাংলা নাসিক্য ধ্বনির উদাহরণ হল – ম্, ন্, ঙ্।

মৌখিক ধ্বনি – শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের সময় যদি স্নিগ্ধতালুর পেছন দিকের আলজিভ সংলগ্ন অংশটি উপরে উঠে উর্দ্ধকণ্ঠের পেছন দিকের দেওয়ালে সংলগ্ন হয়ে যায় তাহলে নাসাপথের বায়ুপ্রবেশের দ্বারটি রুদ্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলশ্রুতিতে শ্বাসবায়ু নাসাপথ দিয়ে প্রবেশ করতে না পেরে শুধু মুখগহ্বর দিয়ে যাতায়াত করে। এইরকম বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে সৃষ্ট ধ্বনিকে মৌখিক ধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় স্পষ্টতই তিন প্রকার মৌখিক ধ্বনি দেখা যায়। কম্পিত ধ্বনি, তাড়িত ধ্বনি, উষ্মধ্বনি। আমরা সংক্ষেপে এই তিন প্রকার মৌখিক ধ্বনির ব্যাপারে জেনে নিতে পারি।

কম্পিত ধ্বনি – শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে জিহ্বা যদি বারবার বাধা দেয় এবং শ্বাসবায়ু যদি সেই বাধা বারবার সরিয়ে দেয় তবে জিহ্বা কম্পিত হতে থাকে। এইরকম জিহ্বার কম্পনের ফলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে কম্পিত ধ্বনি বলে। যেমন – র্।

তাড়িত ধ্বনি – শ্বাসবায়ুর গতিপথে জিহ্বার সম্মুখ প্রান্তভাগ যদি তালুকে মাত্র একবারই টোকা দেয় বা সামান্য একটু স্পর্শ করে যায় এবং শ্বাসবায়ু তাকে বলপূর্বক সরিয়ে দেয়, এত জোরে যে মনে হয় যেন জিহ্বাকে তাড়না করছে, তাহলে এই প্রক্রিয়ায় জন্মজাত ধ্বনিটিকে তাড়িত ধ্বনি বলে। যথা – ড্, ঢ্ ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে।

উষ্ম ধ্বনি –

উর্ধ্বস্থ ও নিম্নস্থ উচ্চারণক বা স্বরতন্ত্রী দু'টি পরস্পরের কাছাকাছি আসার ফলে যদি শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে আংশিক বাধার সৃষ্টি করে এবং সেই বাধা ঠেকে যাতায়াত করার ফলে তখন

একটি ঘর্ষণজাত ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এভাবে উচ্চারিত ধ্বনিকে উষ্মধ্বনি বা শিশুধ্বনি বলে। এর উদাহরণ হল শ্, স্, হ্ ইত্যাদি ধ্বনি।

নৈকট্য ধ্বনি - উর্ধ্বস্থ ও নিম্নস্থ উচ্চারক কাছাকাছি আসার ফলে যদি তাদের মাঝখানের পথটি বেশী সঙ্কীর্ণ না হয়, তবে শ্বাসবায়ুর গতিপথে ঠিক বাধার সৃষ্টি হয় না, কিন্তু যেন একটু বাধার ভাব থাকে। এ অবস্থায় শ্বাসবায়ুর যাতায়াতে কোন ঘর্ষণধ্বনির সৃষ্টি হয় না। এভাবে সৃষ্টি হওয়া ধ্বনিকে ঘর্ষণহীন প্রবাহিত ধ্বনি বা নৈকট্য ধ্বনি বলা হয়।

এর আবার দুটি ভাগ রয়েছে। মধ্যগামী ও পার্শ্বিক। নিম্নস্থ উচ্চারকের সঙ্গে উর্ধ্বস্থ উচ্চারকের নৈকট্য যখন গলা থেকে ওষ্ঠের দিকে সোজাপথে হয় ও শ্বাসবায়ু জিহ্বার মধ্যরেখা বরাবর সোজা পথে যাতায়াত করে তখন মধ্যগামী নৈকট্য-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। বাংলায় এ জাতীয় ধ্বনির উদাহরণ হল য়্। আবার উর্ধ্বস্থ উচ্চারকের সঙ্গে নিম্নস্থ উচ্চারকের নৈকট্য যদি কণ্ঠ থেকে ওষ্ঠের দিকে সামনের পথে না হয়ে নিম্নস্থ উচ্চারক জিহ্বার বাঁ পাশে বা ডান পাশে বা অথবা দু'পাশেই হয় এবং ঐ পাশ দিয়ে যদি শ্বাসবায়ু যাতায়াত করে তবে পার্শ্বিক নৈকট্য ধ্বনির সৃষ্টি হয়। বাংলায় এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল 'ল্' - ধ্বনি।

তরল ধ্বনি - র্ ও ল্ - কে একত্রে একটি পৃথক, শ্রেণীতে ফেলা হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে তরল ধ্বনি।

ঘৃষ্ট ধ্বনি - যদি কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর গতিপথে প্রথমে স্পর্শধ্বনির মতো পূর্ণ বাধা সৃষ্টি হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেই বাধা অন্তর্হিত হয়ে সেটি উষ্মধ্বনির মতো আংশিক বাধায় পরিণত হয় তবে সেই ধ্বনিকে ঘৃষ্ট ধ্বনি বলে। প্রকৃতিগত ভাবে এই ঘৃষ্টধ্বনি হল স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনির যৌগিক রূপ।

এতক্ষণ পর্যন্ত উপরে যে ধ্বনিবৈচিত্রের কথা বলা হল সেগুলি ছিল ফুসফুস-সংযুক্ত বায়ুপ্রবাহের ফলে উৎপন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ। এর পরে ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনির ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। মুখবিবর বা উর্ধ্বকণ্ঠের কাছের বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে যখন ফুসফুসের বায়ুপ্রবাহের যোগ কেটে যায় তখন মুখবিবরস্থ বা উর্ধ্বকণ্ঠস্থ বায়ুপ্রবাহকে ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ বলে। এটি আবার দু'রকম হয় - স্বরতন্ত্রী-চালিত এবং স্নিগ্ধতালু-চালিত। এই দু'প্রকার বায়ুপ্রবাহের প্রত্যেকটিই বহির্গামী ও অন্তর্গামী হতে পারে। সেই অনুসারে ধ্বনির প্রকারভেদ গড়ে ওঠে। এই ভাবে সৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির নাম হল বহিঃস্ফোটক বা হিক্তিত ব্যঞ্জন, অবরুদ্ধ বা অন্তঃস্ফোটক ব্যঞ্জন, ক্লিক বা শীৎকার বা কাকু

ধ্বনি ইত্যাদি। বাংলা ভাষার আদর্শ উচ্চারণে যেহেতু এই ধ্বনিগুলির প্রত্যক্ষ ব্যবহার তেমনভাবে নেই, তাই এগুলির নামোল্লেখ করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির দুটি অতি পরিচিত শ্রেণী হল সঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি এবং মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ বর্ণ। এগুলির পরিচয় এবারে প্রাপ্ত হওয়া যেতে পারে। এগুলি উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণীবিভাগের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে, তাই এখানে সারিবদ্ধ ভাবে এদের আলোচনা করা হচ্ছে।

সঘোষ-অঘোষ ধ্বনি – যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় সেই ধ্বনির সঙ্গে স্বরতন্ত্রী কম্পনজাত সুর বা ঘোষ মিশিয়ে ধ্বনিটি উচ্চারণ করা হয় সেই ব্যঞ্জনধ্বনিকে সঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়। যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করার সময় সেই ধ্বনিটির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর বা ঘোষ মিশ্রিত হয় না তাকে অঘোষ ব্যঞ্জন বলে। এখন বাংলা বর্ণমালায় সঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি চিনে নেওয়ার একটি পরিচিত সূত্র রয়েছে। বাংলায় বর্ণীয় বর্ণের ধ্বনিগুলির মধ্যে বর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি হল অঘোষ ধ্বনি। যেমন – ক্, খ্, চ্, ছ্, ট্, ঠ্। আর বর্ণীয় বর্ণের ধ্বনিগুলির মধ্যে বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ (অর্থাৎ ব্, ভ্, ম্ ইত্যাদি) এবং র্, ল্, হ্, ড়্, ঢ়্, য়্ হল সঘোষ ধ্বনি।

মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ ধ্বনি – উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগের কথা বলতে গিয়ে সর্বশেষে যে ধ্বনিগুলির উল্লেখ করা যায় সেগুলি হল মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ ধ্বনি। ধ্বনি উচ্চারণ-কালে স্বরতন্ত্রী দুটির মধ্যবর্তী স্বরপথ দিয়ে শ্বাসবায়ু যাতায়াত করার সময় স্বরতন্ত্রী দুটি পরস্পরের কাছাকাছি এসে বেশ জোরে আংশিক বাধার সৃষ্টি করে এবং হ্ – জাতীয় একটি আওয়াজ শোনা যায়। এই ‘হ্’ – কে মহাপ্রাণতা বলে।

কোন ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালী সঙ্কুচিত করে স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী স্বরপথে আংশিক অবরোধ সৃষ্টি করে যদি মূল ধ্বনির সঙ্গে ‘হ্’ – ধ্বনি মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। এবং ঠিক একই রকম ভাবে যে ধ্বনির সঙ্গে এই ‘হ্’ – ধ্বনি মিশে থাকে না সে ধ্বনি হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি। সাধারণত বর্ণীয় বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি হল (যথা – ক্, গ্, চ্, জ্) অল্পপ্রাণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি হল (যথা – খ্, ঘ্, ছ্, ঝ্) মহাপ্রাণ ধ্বনি।

১.২.৬ সারাংশ

উপরের আলোচনায় প্রথমেই ধ্বনি ও বর্ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞা প্রদান করে বাংলা বর্ণমালা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। তারপর বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে মুখবিবরের মধ্যস্থ উচ্চারণ স্থান অনুসারে তাদের কণ্ঠ্যবর্ণ, তালব্যবর্ণ, ওষ্ঠ্যবর্ণ, মূর্ধন্য বর্ণ, কণ্ঠতালব্য বর্ণ ও কণ্ঠ্যোষ্ঠ বর্ণ – এই কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বের অবস্থান অনুসারে স্বরধ্বনিগুলিকে আরো কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে – সম্মুখ স্বরধ্বনি, পশ্চাৎ স্বরধ্বনি, কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি, উচ্চ স্বরধ্বনি, নিম্ন স্বরধ্বনি, উচ্চ-মধ্য বা মধ্যোচ্চ স্বরধ্বনি, নিম্ন-মধ্য বা মধ্যনিম্ন স্বরধ্বনি। এগুলির ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে জিহ্ব বা জিহ্বা মুখবিবরের মধ্যে কখন কোন স্থানে অবস্থান করছে। সেই হিসাবেই স্বরধ্বনিগুলিকে নাম দেওয়া হয়েছে। মুখবিবরের মধ্যকার শূন্যতার বিচারেও বাংলা স্বরধ্বনিগুলিকে বিশেষ শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যথা – সংবৃত স্বরধ্বনি, বিবৃত স্বরধ্বনি, অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি, অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি। এগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরে দেওয়া হয়েছে। স্বরধ্বনির শ্রেণীবিন্যাসের সর্বশেষ পরিমাপক হিসাবে বলা হয়েছে ওষ্ঠ বা ঠোঁটের আকৃতির কথা। ঠোঁটের আকৃতির রূপবদলের ভিত্তিতে স্বরধ্বনিকে মোট তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন – প্রসারিত স্বরধ্বনি, কুঞ্চিত স্বরধ্বনি, স্বাভাবিক বা মধ্যস্থ স্বরধ্বনি। এগুলির পরিচয় উপরে রয়েছে।

এবারে আসা যাক ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ও তার শ্রেণীবিভাগের কথায়। ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ প্রধানত করা হয়েছে তার উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুসারে। উচ্চারণ-স্থান অনুসারে খুব সহজ ভাবে ওষ্ঠ্য ধ্বনি, দন্ত্য ধ্বনি, দন্তমূলীয় ধ্বনি, স্নিগ্ধতালব্য ও অলিজিহ্ব ধ্বনি এবং স্বরতন্ত্রী বা কণ্ঠনালীয় ধ্বনির কথা বলা হয়েছে। উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুসারে ধ্বনির শ্রেণীবিভাগের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলে নেওয়া হয়েছে ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি ও ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনির কথা। এর মধ্যে প্রথমটির ক্ষেত্রে ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহের গতিপথে বাধা সৃষ্টির ফলে সৃষ্ট ধ্বনিগুলির কথা বলা হয়েছে, যার আবার দুটি প্রকারভেদ আছে। প্রতিহত ও প্রতিবাহিত ধ্বনি। এই পর্যায়ে ব্যঞ্জনের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে বলা হয়েছে স্পর্শধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি, মৌখিক ধ্বনি, নৈকট্যধ্বনি, ঘৃষ্টধ্বনি কথা। ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি, অর্থাৎ যেখানে মুখবিবর বা উর্ধ্বকণ্ঠের কাছের বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে যখন ফুসফুসের বায়ুপ্রবাহের যোগ কেটে যায়, সেগুলির শুধু নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা ভাষার আদর্শ উচ্চারণে যেহেতু এই ধ্বনিগুলির প্রত্যক্ষ ব্যবহার তেমনভাবে নেই তাই বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করা হয়নি। উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির

শ্রেণীবিভাগে সব শেষে বলা হয়েছে সঘোষ-অঘোষ ধ্বনি ও মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ ধ্বনির কথা, যারা এই বিভাগের অতি পরিচিত নাম।

এভাবেই স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থান ও প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনাটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

১.২.৭ নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় – সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ

ডঃ রামেশ্বর শ – সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

অনুশীলনী – ১

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন এবং উত্তর করা হয়ে গেলে নির্দিষ্ট স্থানে প্রদত্ত উত্তর-সংকেতের সাথে মিলিয়ে নিন উত্তরগুলি।

১) নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরে টিক্() চিহ্ন দিন।

ক) বাংলা ভাষার প্রচলিত বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংখ্যা মোট

১) ১২টি

২) ১৩টি

৩) ১৫টি

খ) ওষ্ঠকে দু’দিকে (অর্থাৎ দুই কানের দিকে) প্রসারিত করে যে স্বরধ্বনির উচ্চারণ করা হয়, তাকে বলে

১) কুণ্ঠিত স্বরধ্বনি

২) প্রসারিত স্বরধ্বনি

৩) মধ্যস্থ স্বরধ্বনি

গ) সম্মুখ স্বরধ্বনি বলা হয় এই স্বরধ্বনিগুলিকে –

১) অ, ও, উ

২) আ

৩) ই, এ, অ্যা

ঘ) ‘ঋ’ – এর উচ্চারণ স্থান মূর্ধা বলে একে বলা হয়

১) ওষ্ঠ্য বর্ণ

২) কণ্ঠতালব্য বর্ণ

৩) মূর্ধন্য বর্ণ

ঙ) গান, আবৃত্তি বা রোদনের সময় হ্রস্ব-দীর্ঘ নির্বিশেষে কোন স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘতর হলে সেই স্বরটিকে বলা হয়

১) প্লুতস্বর

২) অঙ্গীস্বর

৩) মুদ্রাস্বর

চ) যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করার সময় সেই ধ্বনিটির সঙ্গে স্বরতন্ত্রী কম্পনজাত সুর বা ঘোষ মিশ্রিত হয় না তাকে বলে

১) মূর্ধন্য ধ্বনি

২) নাসিক্য ধ্বনি

৩) অঘোষ ব্যঞ্জন

ছ) বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে দন্তমূলীয় ধ্বনির উদাহরণ হল –

১) র, ল, ন্ ধ্বনি

২) প্ ও ফ্ ধ্বনি

৩) শ্, স্, ষ্ ধ্বনি

জ) ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগের দুটি মানদণ্ড হল উচ্চারণ-স্থান এবং

১) উচ্চারণ-মুহূর্ত

২) উচ্চারণের দৈর্ঘ্য

৩) উচ্চারণ-প্রকৃতি

ঝ) ধ্বনির মহাপ্রাণতাকে চিহ্নিত করা হয় এই বর্ণটি দ্বারা –

১) ল্

২) হ্

৩) ক্

ঞ) প্রকৃতিগত ভাবে স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনির যৌগিক রূপ হল

১) ঘৃষ্টধ্বনি

২) হ্রস্বধ্বনি

৩) শীৎকার ধ্বনি

ট) উষ্মধ্বনির অপর নাম কি

১) তাড়িত ধ্বনি

২) বৈচিত্র্য ধ্বনি

৩) শিস্ধ্বনি

ঠ) বাংলা ভাষায় পার্শ্বিক নৈকট্য ধ্বনির উৎকৃষ্ট ধ্বনি হল

১) অ ও আ

২) র্, ড়

৩) ল্

২) নিচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনগুলি শুদ্ধ ও কোনগুলি অশুদ্ধ নিচের চিহ্নিত স্থানে লিখুন।

ক) ধ্বনির খোঁজ করতে গেলে দৃষ্টি দিতে হবে বাংলা বর্ণমালার প্রতি। এই বাংলা বর্ণমালা এসেছে ল্যাটিন বর্ণমালা থেকে।

খ) ং ও ঃ - কে অযোগবাহ বর্ণ বলা হয়।

গ) যে ধ্বনি উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু মুখগহ্বরের মধ্যে কোন না কোন স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নির্গত হয়, তাকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি।

ঘ) 'ই, এ ও অ্যা - এই তিনটি স্বরধ্বনির উচ্চারণে উচ্চারণে জিহ্বা প্রসারিত থাকে বলে এদের বলে প্রসারিত ধ্বনি

ঙ) আ - হল এমন এক স্বরধ্বনি, যা উচ্চারণের সময় অধর ও ওষ্ঠের মধ্যে ফাঁক থাকে সর্বাধিক। তাই একে কুণ্ঠিত স্বরধ্বনি বলা হয়ে থাকে।

চ) ভাষাতত্ত্বের বিচারে বাগ্যন্ত্র হল কথা বলার যন্ত্র।

ছ) ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনির দুটি ভাগ হল - প্রতিহত বা স্পর্শ ধ্বনি এবং প্রতিবাহিত বা প্রবাহী ধ্বনি।

জ) জিহ্বার পশ্চাৎ-ভাগ তালুর পশ্চাৎ-দিকের নরম অংশ বা স্নিগ্ধতালুতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে অলিজিহ্ব ধ্বনি বলে।

ঝ) দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি বাংলায় পাওয়া যায় না। ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী ভাষার কিছু ধ্বনি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

ঞ) যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করার সময় সেই ধ্বনিটির সঙ্গে স্বরতন্ত্রী কম্পনজাত সুর বা ঘোষ মিশ্রিত হয় না তাকে সঘোষ ব্যঞ্জন বলে।

৩) সঠিক শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট রূপে উচ্চারিত হতে পারে, তাকেই বলে।

খ) প্রবাহিত ধ্বনি দু'রকম হয়, ... ও মৌখিক।

গ) ধ্বনি উচ্চারণ কালে জিভের অগ্রভাগ গোল হয়ে বেঁকে যায় এবং জিভের সম্মুখ-প্রান্ত উপরে উঠে পিছন দিকে অর্থাৎ গলার দিকে ঘুরে যায়।

ঘ) সাধারণত বর্ণীয় বর্ণের প্রথম ও ধ্বনি হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

ঙ) জিহ্বার কম্পনের ফলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে..... বলে।

চ) জিহ্বাশিখর বা জিহ্বাপ্রান্ত উপরের দাঁতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে বলে।

ছ) ওষ্ঠ যদি দু'দিকে প্রসারিত না হয়ে ফুঁ দেওয়ার মতো গোল হয়ে আকার ধারণ করে তবে সেই অবস্থায় যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে কুণ্ঠিত স্বরধ্বনি বলে।

১.২.৮ উত্তর-সংকেত

১) ক) ১

খ) ২

গ) ৩

ঘ) ৩

ঙ) ১

চ) ৩

ছ) ১

জ) ৩

ঝ) ২

ঞ) ১

ট) ৩

ঠ) ৩

২) ক) অশুদ্ধ খ) শুদ্ধ গ) শুদ্ধ ঘ) শুদ্ধ ঙ) অশুদ্ধ চ) শুদ্ধ ছ) শুদ্ধ জ) অশুদ্ধ বা) শুদ্ধ ঞ) অশুদ্ধ

৩) ক) স্বরধ্বনি খ) নাসিক্য গ) প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বা মূৰ্ধন্য ধ্বনি ঘ) তৃতীয় ঙ) কম্পিত ধ্বনি
চ) দন্ত্য ধ্বনি ছ) কুঞ্চিত



ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ব্লক-১ একক-৩ : : ভাষার বিশেষ ব্যবহার : বাংলা বাগবিধিঃ বাগধারা ও প্রবাদ

BL-1 Unit-3

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ বিভিন্ন পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

৩.৩ বিশেষ্য পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

৩.৪ বিশেষণ পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

৩.৫ ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

৩.৬ বাগধারা ও এক কথায় প্রকাশ

৩.৬ প্রবাদ

৩.৭ নির্বাচিত পাঠ

৩.৮ উত্তর সংকেত

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- বাগধারা কাকে বলে তা জানতে পারবেন
- বিভিন্ন পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ শিখে তা বাস্তবজীবনে ব্যবহার করতে পারবেন।
- বিশিষ্টার্থক পদগুলি অর্থ বুঝে আপনার ভাষা ব্যবহারকে সুন্দর করতে পারবেন।
- প্রবাদগুলির সঠিক অর্থ জেনে সঠিক স্থানে প্রয়োগ করতে পারবেন।

৩.১ প্রস্তাবনা

পৃথিবীর সব ভাষাতেই মনের ভাব প্রকাশের জন্য কতকগুলি বিশেষ শব্দ-সমবায় আছে। এগুলিকে আমরা বাগবিধি, বাগধারা ও প্রবাদ বলি। বাংলা ভাষার এই বাগধারা বা বিশিষ্ট প্রয়োগগুলি বাংলাকে অন্যান্য অনেক ভাষা থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের

রচনায় প্রয়োগ দেখে এই ধরনের শব্দ-সমবায়ের প্রয়োগ রীতি শিখতে হয়। অনেক ধাতু, বিশেষ্য, বিশেষণ পদ বিশেষ বিশেষ অর্থে বাকের প্রযুক্ত হয়। তাই এই পাঠটিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে।

৩.২ বিভিন্ন পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো লক্ষ করেছেন কোনও কোনও শব্দ বা পদ অন্য কোনও শব্দ বা পদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশেষ প্রসঙ্গে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এই অংশে এই ধরনের কয়েকটি বিশিষ্টার্থক পদ যথা- - বিশেষ্য পদ, বিশেষণ পদ এবং ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করব।

৩.৩ বিশেষ্য পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

প্রথমে বিশেষ্য পদের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করব।

নিচের অংশে আপনি পাঁচটি বিশেষ্য পদ যথা-- ‘‘মুখ‘’, ‘‘মাথা‘’ ‘‘চোখ‘’, ‘‘কান’’ ও ‘‘মাটি’’-র বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষ করুন।

মুখ :

- ১। এমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনতে নেই!(বলতে নেই)
- ২। দেখ, সমীর, তুই মুখ সামলে কথা বলবি! (সংযতভাবে)
- ৩। ছেলেটি ভালো রেজাল্ট করে বাবা-মায়ের মুখ রাখল (সম্মান রাখল)
- ৪। অসিতের এই উদ্ধত ব্যবহারে আমাদের মুখ চুন হয়ে গেল (ম্লান হল)
- ৫। এই দুর্দিনে বিধাতা কি আমাদের দিকে মুখ ভুলে চাইবেন না? (অনুগ্রহ করা)
- ৬। এই সামান্য কথাটা তুমি মুখ ফুটে বলতে পারলে না? (স্পষ্ট করে বলা)
- ৭। তোকে এই কথা বলেছে বলে তুই এইভাবে মুখ খারাপ করবি ? (গালাগালি দেওয়া)
- ৮। কি হে তুমি একেবারে মুখ খুলছ না যে ? (কথা বলা)

মাথা: ১। তোমার এই ধরনের ব্যবহারে সবার মাথা কাটা গেল! (লজ্জিত হওয়া)

- ২। একেবারে মাথায় মাথায় কাজটা সম্পূর্ণ হল। (প্রায় নির্ধারিত সময়ের পরিমাপে)
- ৩। সামান্য কারণেই তোমার মাথা গরম হয়ে যায়। (রেগে যাওয়া)
- ৪। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে আমি দেখে নেব! (সাহস)
- ৫। কার মাথায় হাত বুলিয়ে তুমি এই কাজটি করলে? (ফাঁকি দিয়ে)
- ৬। মহিমবাবুই আমাদের গাঁয়ের মাথা। (প্রধান)
- ৭। আদর দিয়ে ছেলেটির একেবারে মাথা খেয়েছ! (নষ্ট করা)
- ৮। সব সময় ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করো। (ধীর স্থির ভাবে)

চোখ :

- ১। সৎমা ছেলেটিকে ভালো চোখে দেখে না। (পছন্দ করা)
- ২। পরের ভালো দেখলেই নবীনের চোখ টাটায়। (ঈর্ষা হয়)
- ৩। কবে আর তোর চোখ ফুটবে? (সচেতন হওয়া)
- ৪। তোমার চোখ রাঙানিকে আমি ভয় পাই না। (ভয় দেখানো)
- ৫। রমেনের উপর একটু চোখ রেখো (খেয়াল রাখা)
- ৬। তোমার কি চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই? (লজ্জা)
- ৭। পারিজাতের কথায় আমার চোখ খুলে গেছে। (জ্ঞান লাভ হওয়া)
- ৮। চোখ টিপতেই গ্রহরী তাকে ঘিরে ফেলল (ইশারা করা)

কান :

- ১। দুষ্টলোকের মিষ্টি কথাতে কান দিও না (গুরুত্ব দেওয়া)
- ২। আমি যা যা বলছি তা কান পেতে শোনো (মনোযোগ দেওয়া)
- ৩। রমেশ আড়াল থেকে আমাদের কথা কান খাড়া করে শুনতে লাগল (ব্যগ্র হয়ে)
- ৪। তোমার চৈচানি কানে লাগে। (শুনতে খারাপ লাগে)।
- ৫। অন্যের কান ভাঙানো ভালো স্বভাব নয়! (কুমন্ত্রণা দেওয়া)

মাটিঃ

- ১। এখানকার মাটি খুব উর্বর। (জমি)।
- ২। এই দুঃসংবাদে আনন্দটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। (নষ্ট)
- ৩। তোকে এই কথা বলে আমি মাটি করেছি। (বোকামি করা)
- ৪। দশ বছরের মধ্যে তুই একবারও এদিককার মাটি মাড়াসনি। (আসিস নি)
- ৫। মরলে মাটি দেওয়ার জায়গা নেই! (কবর)
- ৬। জিনিসগুলো মাটিতে ফেলে রেখেছিস কেন? (মেঝেতে)
- ৭। সম্পত্তি মাটির দরে ছাড়তে হল। (সস্তায়)
- ৮। চাঁদ কি মাটিতে খসে পড়েছে? (পৃথিবীতে)

৩.৪ বিশেষণ পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

উপরের অংশটি পাঠ করার পর বিশেষ্য পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ সম্পর্কে আপনার সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে। এখন আপনি বিশেষ্য পদের সঠিক প্রয়োগ করতে পারবেন। এই অংশে বিশেষণ পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করব। তিনটি বিশেষণ পদ যথা— “কাঁচা”, “পাকা” ও “মোটা” উদাহরণ হিসাবে নেওয়া হয়েছে। এদের বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করুন।

কাঁচা:

১। এটা যে কাঁচা হাতের লেখা তা দেখলেই বোঝা যায়। (অপরিশ্রুত)

২। তুমি বাপু এটা একেবারে কাঁচা কাজ করেছ। (ত্রুটিপূর্ণ)

৩। উত্তম অঙ্কে একেবারেই কাঁচা। (অপটু)

৪। কাঁচা দুধে পায়ের হাবা না, ফোটাতে হবে। (ফোটা নয়, এমন)

৫। মেয়েটির গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মতো। (ফর্সা)

৬। ছেলেটাকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগিও না (সদ্য ঘুম)।

৭। বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তায় চলাফেরা কষ্টদায়ক (মেটে, বাঁধানো নয় এমন)

৮। অল্প বয়সে কাঁচা পয়সা পেয়ে ছেলেটা উচ্ছিন্নে গেল। (নগদ)

পাকা :

- ১। একটু এগিয়ে গেলেই পাকা রাস্তা পেয়ে যাবেন (বাঁধানো)।
- ২। পাকা ইটের বাড়ি করো, মজবুত হবে। (পোড়ামাটির)
- ৩। আগামী কাল শুচিতার বিয়ের পাকা কথা হবে। (চূড়ান্ত)
- ৪। পাকা খাতায় হিশেব তুলে ফেলেছি আর কাটা যাবে না। (সংশোধিত, শেষ)
- ৫। পাকা রঙের শাড়ি, কাচলেও রং উঠবে না। (স্থায়ী)
- ৬। এরকম পাকা সোনার গয়না আজকাল পাবে কোথায় ? (খাঁটি)
- ৭। একি আর যে-সে কাজ, একেবারে পাকা হাতের কাজ! (অভিজ্ঞ, দক্ষ)।
- ৮। দেখতে দেখতে পাকা (বা পাক্ক) একটি বছর পার হয়ে গেল (পুরো)।

মোটাঃ

- ১। এরকম মোটা গলায় গান মানায় না (হেঁড়ে)।
- ২। “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে-রে ভাই” (কমদামি)
- ৩। যুদ্ধের বাজারে নরেনবাবু মোটা টাকা কামিয়েছেন! (প্রচুর)
- ৪। সনৎ মোটা বুদ্ধির ছেলে। (বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নয়)।
- ৫। সবিতা খুব মোটা হয়ে গেছে (মেদবহুল)।

৩.৫ ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করার পর ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করব। এই অংশে তিনটি ক্রিয়াপদের যথা- “কাট”, “ধর?” এবং “ওঠা”-এর বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখতে পাবেন।

কাট :

- ১। দুঃখের রাত যেন আমার কাটতেই চায় না! (শেষ হওয়া)
- ২। কবিতার বই বাজারে কাটে কম। (বিক্রি হয়)
- ৩। দুধে লেবু দিয়ে ছানা কেটে নাও। (তৈরি করে)
- ৪। তুই সব কথাতেই ফোড়ন কাটিস না তো! (টিপ্পনি দেওয়া)
- ৫। বৈষ্ণবরা কপালে তিলক কাটে। (আঁকে)
- ৬। আমি রমেনকে একখানা পাঁচশো টাকার চেক কেটে দিলাম। (লিখে)
- ৭। স্কুল থেকে সোমেনের নাম কেটে দিয়েছে। (বহিষ্কার করেছে)
- ৮। গান গাইতে গাইতে রমার তাল কেটে যায়। (ছন্দপতন হয়)

ধরা:

- ১। ধর, তুমি ওকে গিয়ে পেলে না, তাহলে কী করবে? (মনে করো)
- ২। মিতা জেদ ধরেছে যে ও অরুণকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। (প্রতিজ্ঞা)
- ৩। কচু খেলেই আমার গলা ধরে। (চুলকোয়)
- ৪। রোজ বিকেলেই আমার মাথা ধরে। (ব্যথা করে)
- ৫। ডাক্তার রনির রোগ ধরতেই পারলেন না। (নির্ণয় করতে)
- ৬। গোবিন্দ আজকাল মদ ধরেছে। (আসক্ত হয়েছে)
- ৭। ধরা গলায় গান ভালো শোনায় না। (ভাঙা গলা)
- ৮। একটু বসো, বৃষ্টিটা ধরলে চলে যেও। (কমলে)

ওঠাঃ

- ১। মুষলধারে বৃষ্টির পরে ঝকঝকে রোদ উঠেছে (প্রকাশ পেয়েছে)
- ২। এত আলো ওর মন ওঠে না (সন্তুষ্ট)
- ৩। “উঠ গো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি জগতজন পূজ্যা” (জেগে ওঠা, দাঁড়ানো)
- ৪। কথাটা বড়বাবুর কানে উঠলে খুব খারাপ হবে। (শুনলে)
- ৫। শান্তনুরা এ বাড়ি থেকে উঠে গেছে। (চলে গেছে)
- ৩। কমলার চোখ উঠেছে। (চোখের একটা বিশেষ রোগ)
- ৭। তখনকার সমাজপতিরা সবিতাকে আর সমাজে তুলল না। (মর্যাদা দেওয়া)

অনুশীলনী- ১

নিচের প্রশ্নগুলি উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে নিচে দেওয়া উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে

দেখুন।

১। শূন্যস্থানের নিচে দেওয়া শব্দগুচ্ছের মধ্য থেকে উপযুক্ত শব্দবন্ধ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) আমি তোর..... ভয় পাই?

- (১) চোখ টেপা
- (২) চোখ ওঠানো
- (৩) চোখে পড়ায়
- (৪) চোখ রাঙানোয়।

খ) এখন জমাটি আসরটা একেবারে.....দিল।

- (১) মাটি দিয়ে
- (২) মাটি করে
- (৩) মাটি ফেলে
- (৪) মাটি মাড়িয়ে।

গ) ছেলেটা আদর পেয়ে পেয়ে.....।

- (১) মাথা কেটেছে
- (২) মাথা ঘামিয়েতে
- (৩) মাথা বুলিয়েছে
- (৪) মাথায় উঠেছে

ঘ) দীপা এমন কথা পারল?

- (১) মুখে আনতে
- (২) মুখ করতে
- (৩) মুখ খুলতে
- (৪) মুখ রাখতে।

চ) প্রদীপ এত..... করার ছেলে নয়।

- (১) কাঁচা টাকা
- (২) কাঁচা দৌড়
- (৩) কাঁচা কথা
- (৪) কাঁচা কাজ

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ছ) র সময় মেয়েকে ওরা বাজুবন্ধ দিয়ে গেল।

- (১) পাকা দেখা
- (২) পাকা হাত
- (৩) পাকা কাজ
- (৪) পাকা লোক

জ) বিষ্ণুবাবু কালোবাজারী করে করেছেন।

- (১) মোটা টাকা
- (২) মোটা কারবার
- (৩) মোটা ভাত
- (৪) মোটা তাকিয়া

ঝ) বাজারে কবিতার বই.....কম।

- (১) হাতায়
- (২) দাঁড়ায়
- (৩) পাকে
- (৪) কাটে

ঞ) কাজটা ভালো তো হবেই, এই কাজ করে করেই তো মেয়েটা!

- (১) হাত লাগিয়েছে
- (২) হাত পাকিয়েছে
- (৩) হাত কামড়িয়েছে
- (৪) হাত ধুয়েছে

ট) সমীরের হাতে আজকাল আসাতে দুটো বাইক কিনেছে।

- (১) কাঁচা চাল
- (২) কাঁচা পয়সা
- (৩) কাঁচা মাথা
- (৪) কাঁচা গুটি

ঠ) পিন্টুটা ওরকমই, পড়াশুনায় ওর মাথা নেই। এখানে মাথা মানে—

- (১) মাথার রোগ
- (২) চিন্তা করা
- (৩) বুদ্ধি
- (৪) লম্বা

ড) কী ব্যাপার, তোমার যে দেখাই নেই! এখানে দেখা বলতে বোঝানো হল--

(১) পাওয়া

(২) হয়েছে

(৩) ব্যথা

(৪) সাক্ষাৎ

২) উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে নিচে শূন্য স্থানগুলোকে পূরণ করুন।

ক) এ ব্যাপারে আপনার মাথা লাভ নেই। তুলে/ ঘামিয়ে

খ) গরিবের দুঃখের দিকে আজকাল কেউ মুখ তাকান না। তুলে/মানিয়ে

গ) সময় মতো চোখে দুর্দশা হত না। এলে/পড়লে

ঘ) হাত কাজটা না করলে সময় মতো শেষ হবে না। চালিয়ে/ঘুরিয়ে

ঙ) হে ভারতবাসী,.....জাগো, অগ্রসর হও! ওঠো/তোলো

৩.৬ বাগধারা

একাধিক নির্দিষ্টপদ ধরাবাঁধা ক্রমে বাক্যে প্রযুক্ত হয়ে সাধারণ অর্থের চেয়েও অতিরিক্ত বিশেষ কোনও অর্থ প্রকাশ করে এবং এর সঙ্গে অভিধানে প্রদত্ত অর্থের কোনও সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। এই ধরনের পদ প্রয়োগে ইঙ্গিতপূর্ণ সুদ অর্থ এবং বক্তব্য বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। এই ধরনের পদের প্রয়োগে বক্তব্য বিষয় সংক্ষিপ্ত অথচ রসসিক্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক ভাষাতেই ভাব প্রকাশের জন্য এই রকমের বাগধারা আছে। নিচে বাংলা বাগধারার কিছু প্রয়োগ দেখানো হচ্ছে।

অকাল কুস্মান্ধ (অপদার্থ) : এত সুযোগ পেয়েও তুই জীবনে কিছুই করতে পারলি না, একে বারে অকাল কুস্মান্ধ।

অকুল পাথার (মহা বিপদ) : হঠাৎ করে ওর বাবার মৃত্যুতে সাধন অকুল পাথারে পড়ে গেল।

অন্ধের যষ্টি (একমাত্র অবলম্বন) : একমাত্র ছেলের মৃত্যুর পর নাতিটিই বিপিনবাবুর অন্ধের যষ্টি হয়েছে।

অরণ্যে রোদন (নিঃশব্দ আবেদন) : বড় সাহেবকে এত করে অনুরোধ করলাম
কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন হল।

অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ দর্শন) : কি হে! তুমি যে একেবারে অমাবস্যার চাঁদ
হয়ে গেছ, তোমার দেখাই পাওয়া যায় না।

অহি-নকুল সম্বন্ধ (ঘোর শত্রুতা) : বাবার মৃত্যুর পর সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাইয়ের
মধ্যে এখন অহি-নকুল সম্বন্ধ।

আকাশ কুসুম (অবাস্তব কল্পনা) : লটারির টাকা পেয়ে বাড়ি তৈরি
করার চিন্তা আকাশ কুসুম কল্পনা বই আর কিছু নয়।

আক্কেল সেলামী (বোকামির জন্য লোকসান) : খোঁজ খবর না নিয়ে অচেনা
লোকটির জামিন হয়ে এখন এক হাজার টাকা আক্কেল সেলামী দিতে হল।

আক্কেল গুডুম (হতবুদ্ধি) : ঐটুকু ছেলে গাছে উঠে নারকেল পেড়েছে শুনেই আমার তো আক্কেল গুডুম!
আদা জল খেয়ে লাগা (উদ্যম সহকারে কাজ করা) : পরীক্ষায় ভালো ফল
করতে হলে, এখন থেকেই আদা জল খেয়ে লেগে পড়।

আমড়া কাঠের টেকি (অকর্মণ্য) : এতদিনে আমার আর বুঝতে বাকি নেই
যে আসলে ছেলেটি আমড়া কাঠের টেকি, ওর দ্বারা কিছুই হবার নয়!

আমতা আমতা করা (দ্বিধা করা) : সাক্ষীটি উকিলের জেরার মুখে আমতা আমতা
করতে লাগল।

আমড়াগাছি (তোষামোদ) : বড়বাবুর কাছে আমড়াগাছি করে কোনও লাভ হবে
না, ও প্রোমোশন তোমার হবে না!

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক) : মোহনবাবুর ছেলেটি ভীষণ ইঁচড়ে পাকা হয়েছে,
বড়দের মুখে মুখে কথা বলে।

উত্তম-মধ্যম (প্রহার, মার) : চোরটাকে ধরে সবাই মিলে উত্তম-মধ্যম দিল।

উলুবনে মুক্তো ছড়ানো (অপাত্রে দান) : চোরকে সদুপদেশ দেওয়া তো উলুবনে মুক্তো ছড়ানো।

একচোখো (পক্ষপাতিত্ব দুষ্ট) : মহিমবাবুর মতো একচোখো লোকের কাছে উচিত
বিচারের আশা করা বৃথা।

কড়ায় গণ্ডায় (পুরোপুরি হিসেব করে) : আমার কাজটা শেষ হলেই আমি তাকে
কড়ায় গণ্ডায় পাওনা শোধ দেব।

কলুর বলদ (অপরের আজ্ঞাধীন) : কলুর বলদের মতো সারাদিন খেটে মরি আর গাল খা

কত ধানে কত চাল (কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতা) : এখন সংসারের জোয়াল কাঁধে পড়েছে, এখন বুঝতে পারবে
কত ধানে কত চাল!

কথার কথা (আসল কথা নয়) : মধুরাদি আসবে বলল, ওসব কথার কথা, আসলে ও আসতে পারবে না।

কানপাতলা : (যে সবার কথা বিনা বিচারে বিশ্বাস করে) : আমাদের বড়সাহেব খুব কান পাতলা লোক, যে যাই
বলে তাই বিশ্বাস করেন।

কাঁচা পয়সা (নগদ টাকা): কি রে! কিছু কাঁচা পয়সা পেয়ে মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করছিস না।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে (- একটি কষ্টের উপর আরও কষ্ট) : এমনিতেই এবার ব্যবসাতে অনেক টাকা
লোকসান হল, তার উপরে বাড়িতে বাড়িতে চুরি হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি, একেই বলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে!

কালে ভদ্রে (কদাচিৎ) : ওর সঙ্গে আমার কালে ভদ্রে কথা হয়।

কেঁচে গণ্ডুষ (নতুন ভাবে শুরু করা) : ছোটবেলায় যা পড়েছি সব ভুলে বসে আছি, এখন ছেলেকে পড়াতে
গিয়ে দেখছি কেঁচে গণ্ডুষ না করলে আর উপায় নেই।

কেষ্টবিষ্ট (গণ্যন্য লোক) : পশুপতিবাবু একজন কেষ্টবিষ্ট লোক! তাঁর কথা পাঁচটা লোকে মানবে।

খয়ের খাঁ (তোষামোদকারী) : স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়েও আমাদের দেশের একদল লোক নিজেদের
স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজের খয়ের খাঁ হয়েই ছিল।

গড্ডালিকা প্রবাহ (ভেড়ার পালের মতো অন্ধ অনুসরণ) : আজকাল অধিকাংশ লোকই গড্ডালিকা প্রবাহে গা
ভাসিয়ে দিয়ে চলেছে, নিজস্ব চিন্তা বলে কিছু নেই।

গোকুলের ষাঁড় (নিষ্কর্মা ভবঘুরে) : উপেন্দ্রবাবু এত বড় একজন নামকরা লোক আর ওঁর ছোট ছেলেটা যা হচ্ছে তাই করে বেড়ায়-- একেবারে গোকুলের ষাঁড় তৈরি হচ্ছে।

গোবরে পদ্মফুল (অসৎ বংশে সজ্জনের আবির্ভাব) : যেমন মতিবাবু তেমনি তার ছেলেরা, সবাই উচ্ছৃঙ্খল কিন্তু ছোট ছেলেটি যেমন ভদ্র তেমনি সৎ, একেবারে গোবরে পদ্মফুল।

গো-বেচারী (নিরীহ) : উদয় একেবারেই গো-বেচারী, কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।

গোঁয়ার-গোবিন্দ (কাণ্ডজ্ঞানশূন্য জেদী) : তোমার মতো গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক তো আমি দেখিনি বাপু, কোনো কথা শুনতে চাও না!

গুড়ে বালি (নিষ্ফল আশা) : ভেবেছো জ্যাঠামশায়ের সম্পত্তি পেয়ে দুহাতে ওড়াবে, সে গুড়ে বালি, তিনি আগেই সম্পত্তি মিশনকে দিয়ে গেছেন।

ঘুণাঙ্করে টের পাওয়া (বিন্দু বিসর্গ জানতে পারা) : সাবধান এ কথা কেউ যেন ঘুণাঙ্করে টের না পায়।

চিনির বলদ (ভারবাহী কিন্তু ফলভোগী নয়) : চিনির বলদের মতো কেবল খেটেই মরেছি, বদলে কিছুই পাইনি।

চাঁদের হাট (গুণীজন সমাবেশ) : বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষে শহরের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপকের সমাবেশ হয়েছিল, বাড়িতে যেন চাঁদের হাট বসে গিয়েছিল।

চোখের বালি (চক্ষুশূল ব্যক্তি, যাকে সহ্য করা যায় না) : ছেলেটি তার সতমার চোখের বালি।

চুনোপুঁটি (সামান্য ব্যক্তি) উনি আজকাল বড় হয়ে গেছেন, আমাদের মতো চুনোপুঁটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না।

চোখের মাথা খাওয়া (অসাবধানতাবশত না দেখা) : তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ, সামনেই পড়ে আছে জিনিসটা অথচ তুমি দেখতেই পাচ্ছ না!

ছাই চাপা আগুন (প্রচ্ছন্ন প্রতিভা) : তার ভিতরে যে এত প্রতিভা আছে তা আগে বোঝা যায়নি, এখন দেখছি এ যে ছাই চাপা আগুন।

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (ঝামেলার কাজের জন্যে নগণ্য ব্যক্তিকে ডাকা) : আমি তো ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, যে কাজ কেউ করতে চায় না সেই কাজ করার জন্যেই তো আমার ডাক পড়ে।

জিলিপির প্যাঁচ (কুটিল বুদ্ধি) : ওর মনে যে এমন জিলিপির প্যাঁচ তা তো আগে বুঝতে পারিনি।

জগা-খিচুড়ি (- বিচিত্র জিনিষের সংমিশ্রণ) : সব কিছু ওলট-পালট করে একেবারে জগা-খিচুড়ি করে রেখেছ, একটু গুছিয়ে রাখতে পারতে।

ঝাড়া হাত-পা (যার কোনো পিছুটান নেই): তোমার তো কোনও দায়-দায়িত্ব নেই, একেবারে ঝাড়া হাত-পা!

ঝড় ঝাপটা (বাধাবিঘ্ন) : জীবনে উন্নতি করতে গেলে অনেক রকম ঝড় ঝাপটাই সহ্য করতে হয়।

টনক-নড়া (চৈতন্য হওয়া); এতদিনে তোমাদের টনক নড়েছে যে কাজটা করা ঠিক হয়নি?

টাকার কুমির (অনেক টাকার মালিক) : এত সাদাসিধে দেখালে কি হবে-- পুলকবাবু একজন টাকার কুমির।

ঠোঁট কাটা (স্পষ্ট বক্তা) : ঠোঁট কাটা লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে যাও, দরকার মত দুকথা শুনিয়ে আসতে পারবে।

ডান হাত (প্রধান সহায়) : একসময় অরবিন্দবাবু সাহেবের ডান হাত ছিলেন।

ডান হাতের ব্যাপার (খাওয়া দাওয়া) ডানহাতের ব্যাপারটা আগে চুকিয়ে নিন, তারপর আবার কাজে লাগা যাবে।

ডুমুরের ফুল (- দুর্লভ দর্শন) : একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে দেখছি, আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না।

টিমে-তেতালা (খুব ধীর গতি) : আরে এত টিমে-তেতালা হলে কি চলে? আর একটু হাত চালিয়ে কাজ কর।

তীর্থের কাক (প্রত্যাশী ব্যক্তি) : সেই সকাল থেকে তীর্থের কাকের মতো বসে আছি দুটো টাকার জন্য!

তাসের ঘর (সহজে ভেঙে যায়) : অসৎ পথে অর্জিত এই বিপুল ঐশ্বর্য একদিন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে।

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা (5 ভীষণ রেগে যাওয়া) : পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েছি দেখলে বাবা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন।

দেহ রাখা (মারা যাওয়া) : আমার দাদু কাশীতেই দেহ রাখলেন।

দাঁত ফোটানো (বুঝে ওঠা) : এবারের পরীক্ষায় যে প্রশ্ন হয়েছে তাতে দাঁত ফোটানো দায়।

ধনুক ভাঙ্গা পণ (কঠিন প্রতিজ্ঞা) : সে এবার ধনুক ভাঙ্গা পণ করেছে যে

পরীক্ষায় পাশ না করা অবধি আর ফুটবল ছোবে না।

ধরাকে সরা জ্ঞান (অহঙ্কারে সবাইকে অবজ্ঞা করা) : হঠাৎ করে কিছু কাচা
পয়সা পেয়ে শৈলেনবাবু ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন।

থামা ধরা (খোসামদকারী) : ব্রিটিশ সরকার তাদের থামা ধরা লোকদের বিশেষ
সম্মানে ভূষিত করতেন।

নখদর্পণে (ভালভাবে জানা) : কোলকাতায় কোথায় কি পাওয়া যায় এ সব
কিছুই অশোক বাবুর নখদর্পণে।

ননীর পুতুল (কষ্ট সহ্য করতে অক্ষম) : শঙ্করী যেন একেবারে ননীর পুতুল, এইটুকু রাস্তা হেঁটেই ও পায়ের
ব্যথায় নড়তে চড়তে পারছে না।

পরকাল ঝরঝরে (ভবিষ্যৎ নষ্ট): এখন থেকে ভাল করে পড়াশোনা কর নইলে কিন্তু পরকাল ঝরঝরে বলে
দিচ্ছি।

পায়া ভারী (উঁচুপদের জন্য গর্ব) প্রমোশন পেয়েই ফণীন্দ্রবাবুর পায়া ভারী হয়েছে, একেবারে ধরাকে সরা জ্ঞান
করছে।

পাকা ধানে মই দেওয়া (সর্বনাশ করা) : আমি যে তোমার কী পাকা ধানে মই দিয়েছি বুঝতে পারছি না,
তুমি আমার পেছনে লেগেছ কেন?

বকধার্মিক বা বিড়াল-তপস্বী (ভণ্ড) : মুখে হরি হরি বললে কি হবে, আসলে উনি একজন বকধার্মিক!

বিনা মেঘে বজ্রপাত (হঠাৎ বিপদ বা অশুভ ঘটনা) : একমাত্র ছেলের অকস্মাৎ মৃত্যুর খবরে বিমানবাবুর
মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হল।

বুকের পাটা (সাহস) : মকবুলের বুকের পাটা আছে বলতে হবে, নইলে মুখের সামনে বড়কর্তাকে দুকথা
শুনিয়ে দিল!

ভূতের বেগার (পশুশ্রম): যে কাজে তোমার কোন লাভ নেই, সে কাজে কেন যে মিছামিছি ভূতের বেগার
খাটছো বুঝতে পারছি না।

মগের মূলুক (অরাজকতা) : দিন দুপুরে খুন-খারাবি, ডাকাতি, রাহাজানি,এ সব কি ঘটছে, দেশটা কি একেবারে মগের মূলুক হয়ে উঠল নাকি?

মাটির মানুষ (- নিরীহ) : আমাদের স্কুলের পণ্ডিত মশাই একজন মাটির মানুষ ছিলেন, আমরা কত উপদ্রব করেছি কিন্তু তিনি সব হাসি মুখে সহ্য করতেন। .

মিছরির ছুরি (মিষ্টি অথচ বেদনাদায়ক) : জামিল সাহেবের কথাগুলো যেন একেবারে মিছরির ছুরি, শুনতে মিষ্টি অথচ যেন আঁতে গিয়ে বেঁধে।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলা (কঠোর পরিশ্রম করা) : মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কোন রকমে সংসারটাকে একটু দাঁড় করেছি অথচ ছোট ভাইটি আমার কোন কথাই কানে তোলে না।

শাঁখের করাত (উভয় সঙ্কট) : কারখানায় গেলে ইউনিয়নের নেতারা ধরবেননা গেলেও বড়বাবু রক্ষা রাখবেন না, একেবারে শাঁখের করাতে পড়েছি।

সাত-পাঁচ (নানা প্রকার) : সাত-পাঁচ ভেবে আমি চন্দনকে আর একথাটা জানালাম না।

সোনায়ে সোহাগা (শুভ সংযোগ) : অমল পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়েছে আবার ওদিকে লটারীতেও একলক্ষ টাকা পেয়েছে এয়েন সোনার সোহাগা।

শিবরাত্রির সলতে (একমাত্র বংশধর) : পর পর দুটো ছেলের মৃত্যুর পর জননী কোলের এই শিব রাত্রির সলতেটি নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছেন।

হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা প্রকাশ করা) : আমাকে রাগিও না বলছি, একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (উপস্থিত সুযোগ ত্যাগ করা) : তুমি যে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে ফেললে, এ জন্য পরে কিন্তু তোমাকে অনুতাপ করতে হবে, বলে দিলাম।

৩.৭ বাংলা প্রারম্ভিক পাঠক্রম

অনুশীলনী - ২

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন, উত্তর করা হয়ে গেলে উত্তরসংকেত দেখুন।

১) নিচে দেওয়া শব্দগুলো থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে সঠিক বাগধারা তৈরি করুন :

কান, পাঁচ, করাত, সেলামী, অমাবস্যার, সোনায়ে, পুঁটি, খিচুড়ি, অরণ্যে, ধার্মিক, গন্ধুয
ডুমুরের, মগের, বদল, চিনির, হাত, খয়ের, কাচা, স্কট, আক্কেল, গোঁয়ার, গডডলিকা, মাটির,
দুলাল, বেচারী, ছাই চাপা, গলদ, গলা, তপস্বী, পাতলা, নড়া।

ক)_____মুন্সুক

খ) আদরের_____

গ)_____পাতলা

ঘ)সাত_____

ঙ)আক্কেল_____

চ) টনক_____

ছ) শাঁখের_____

জ)_____সোহাগা

ঝা) _____রোদন

ঞ)বক_____

ট)_____চাঁদ

ঠা)_____আগুন

ড) গোড়ায়_____

ঢা)_____প্রবাহ

ণা)_____খাঁ

২) নিচে দেওয়া বিশিষ্টার্থক পদটির সঠিক অর্থটি -টিক: (☒ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন--

ক) কি হে! অমল, আজকাল যে তোমার দর্শনই
পাওয়া যায় না, একেবারে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেলে নাকি?

(১) অপদার্থ_____

(২) শত্রু_____

(৩) দুর্লভ দর্শন_____

(৪) অনভিজ্ঞতার দণ্ড_____

খ) যুদ্ধের বাজারে চোরা কারবার করে অনেকেই

আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে।

(১) হঠাৎ ধনী_____

(২) দীর্ঘ শত্রুতা_____

(৩) হতবুদ্ধি_____

(৪) অলস_____

গ) স্বাধীনতার আগে অনেক ভারতীয়রাই ইংরেজদের খয়ের খাঁ ছিল।

- (১) পরাধীন চাকুরে-----
- (২) পক্ষপাত ভোগী-----
- (৩) অকালপক্ক-----
- (৪) তোষামোদকারী-----

ঘ) “মা আমায় ঘুরাবি মত কলুর চোখ বাঁধা বলদের মতো”

- (১) ফলভোগী নয়-----
- (২) পরাধীন চাকুরে-----
- (৩) অপ্রিয় বাক্তি-----
- (৪) অকর্মণ্য-----

ঙ) তোমার মতো গোবর গণেশ আর দ্বিতীয়টি নেই।

- (১) অকর্মণ্য-----
- (২) তোষামোদকারী-----
- (৩) অপ্রিয় বাক্তি-----
- (৪) গুণী লোক-----

চ) এবারের অঙ্কের প্রশ্ন যা হয়েছিল মেধাবী ছাত্ররাও দাঁত ফোটাতে পারে নি।

- (১) বুঝে উঠতে পারা
- (২) হতাশ হওয়া
- (৩) পণ্ডশ্রম করতে
- (৪) কুটিল বুদ্ধি

ছ) পর পর দুটো ছেলের মৃত্যুর পর জননী কোলের এই শিবরাত্রির সলতেটি নিয়েই দিন কাটাচ্ছেন।

- (১) শেষ বয়সের সম্বল-----
- (২) এক পাল-----
- (৩) কেচে গণ্ডুষ-----
- (৪) একমাত্র বংশধর-----

জ) যে কাজে একটি পয়সাও আয় নেই সেকাজে শুধু শুধু ভূতের বেগার খেটে লাভ কি?

- (১) মন নিয়ে-----
- (২) শ্রমের বিনিময়ে-----
- (৩) কান ভারি করা-----
- (৪) কঠোর পরিশ্রম করা-----

ঝ) আমাকে রাগিয়ো না, তাহলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো।

- (১) গুপ্ত বিষয় প্রকাশ -----
- (২) আসন্ন বিপদ-----
- (৩) সর্বনাশ করা-----
- (৪) উভয় সঙ্কট-----

ঞ) গায়ে নামাবলী থাকলে কী হবে আসলে উনি একজন বিড়াল তপস্বী

- (১) রূপবান -----
- (২) সুচতুর-----
- (৩) চমৎকার লোক-----
- (৪) ভণ্ড-----

৩) নিচে দেওয়া বাক্যগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ দিন।

- (ক) শরৎকালের পূজাই বাঙালীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব।
- (খ) বুদ্ধের উপাসকগণ গার্হস্থ্য ধর্ম মানেন না।
- (গ) যে ধান বপন করা হয়েছে সে ধান কোথায় পেয়েছে?
- (ঘ) ভূত আছে যে বাড়িতে সে বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়।
- (ঙ) যে ফুলের গন্ধ আছে সে ফুল সবারই প্রিয়।

প্রবাদ

প্রবাদ কথাটির সঙ্গে আপনি নিশ্চয়ই পরিচিত। প্রবাদ বলতে কি বোঝায়?

প্রবাদের দ্বারা সরল ও সহজভাবে অথচ শোভন ভঙ্গিতে অল্প কথায় জীবনের

গভীরতম সত্যের স্বচ্ছ প্রকাশ করা হয়। মোটামুটিভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়

যে প্রবাদ দুরকমের হয় (ক) লোকোক্তি এবং (খ) প্রাজ্ঞোক্তি।

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার প্রকাশ সাধারণভাবে জনপ্রিয় হয়ে পড়ে লোকোক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত

হয়। অপর পক্ষে প্রাজ্ঞোক্তির উদ্ভব জ্ঞানী ও গুণীব্যক্তিদের কথিত উপদেশাবলীতে। গুণীজনের নীতি উপদেশ

লোক পরম্পরায় প্রচারিত হয়ে প্রাজ্ঞোক্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা বা বিজ্ঞজনের উক্তি মাত্রই

প্রবাদে পরিণত হয় না। সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের উপর। যেখানে অনেক কথা

বলেও মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না, সেখানে কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে মনের ভাব সংক্ষিপ্ত অথচ

সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় এবং তা শ্রোতা আনন্দের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ভাষার পরিবর্তন হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুগের পরিবর্তনেও অনেক সময় প্রবাদে কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রবাদে কয়েকটি গুণ থাকা আবশ্যিক। যেমন— (ক) সরলতা, (খ) সহজবোধ্যতা (গ) অল্প শব্দপ্রয়োগে গভীর ভাব প্রকাশের সামর্থ্য (ঘ) লোক চরিত্র বিষয়ক অনুভূতি ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি প্রবাদ ও তাদের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হল। প্রবাদ অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখতে হলে আগে প্রবাদে তাৎপর্য ভাল করে বুঝতে হবে, তারপর সেই অর্থ ব্যাখ্যা করে পনেরো কুড়িটি বাক্যরচনা করা যেতে পারে।

“অতি দর্পে হতা লক্ষা”-- বেশি গর্ব সর্বনাশের কারণ।

“অধিক সন্ধ্যাসীতে গাজন নষ্ট”-- কোনও ব্যাপারে অনেক লোকের কর্তৃত্ব থাকলে কাজ পন্ড হয়।

“অতি লোভে তাঁতী নষ্ট”-- বেশি লোভ করলে নিজেরই ক্ষতি হয়।

“অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ”-- খারাপ উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে নিজেকে ভক্তিমান বলে প্রচার করার চেষ্টা করা।

“আপনি বাঁচলে বাপের নাম”--সব সময় নিজেকে বাঁচিয়ে চলা।

“আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়”-- অপরকে উপদেশ দেবার আগে নিজে তা পালন করা।

“ইঁটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়”--অকারণে কাউকে বিরক্ত করলে তার কাছ থেকে প্রতিফল পেতে হয়।

“উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়েরে”--একের প্রাপ্য অন্যের ওপরে চাপানো।

“এক টিলে দুই পাখি মারা”-- এক সঙ্গে দুটো উদ্দেশ্য সাধন করা।

“এক মাঘে শীত যায় না”--একবার বিপদ কেটেছে বলে বার বার কাটবে এমন নয়।

“কনের ঘরের পিসী, বরের ঘরের মাসী”--- যে ভালো মানুষ সেজে একের বিরুদ্ধে অন্যকে প্ররোচনা দেয়।

“কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরালেই পাজি”-- স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তোষামোদ করা এবং স্বার্থ সিদ্ধি হয়ে গেলে আর কোনও সম্পর্ক না রাখা।

“কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ”-- একই কাজে কেউ লাভবান হওয়া এবং কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

“কানা গরু বামুনকে দান”---অপ্রয়োজনীয় (অকেজো) জিনিস দান করে নাম কেনা।

“গাছে কাঠাল পোঁফে তেল”--- কিছু পাওয়ার আগেই ভোগের কল্পনা করা।

“খাচ্ছিল তাতী তাত বুনে কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে”--- যে যে-কাজের অনুপযুক্ত সে সেই কাজ করতে গেলে ফল বিপরীতই হয়।

“গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না”--অতি পরিচিত লোক গুণী হলেও উপযুক্ত মর্যাদা পায় না।

“ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়”--- কোন কাজে যিনি একবার ঠকেছেন, সেই

কাজ আবার করতে ভয় পান।

“ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া”--প্রধান উদ্যোক্তাকে বাদ দিয়ে কাজ সিদ্ধি করার চেষ্টা।

“চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না”--অতি পরিচিত লোকের অন্য কোনও পরিচয়ের দরকার হয় না।

“চোরে চোরে মাসতুতো ভাই”---দুই অসাধু ব্যক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকে।

“চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে”---বিপদের সময় হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া কিন্তু বিপদ কাটলে বুদ্ধি খোলে ।
 “চোরের মায়ের বড় গলা--- কোনও অপরাধ করে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার চেষ্টা ।
 “জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ”--- যার ওপরে নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই তাকে
 অসম্ভব করা ।
 “সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে”--- যার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে সেই সেটা ভাল বোঝে ।
 “ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়”--- অসৎ লোকের সংখ্যাই বেশি ।
 “ডুবে ডুবে জল খাওয়া”---গোপনে কার্য সিদ্ধির চেষ্টা ।
 “টিল মারলেই পাটকেল খেতে হয়--- অন্যের ক্ষতির চেষ্টা করলে নিজেরও ক্ষতি হয় ।
 “টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে”--- ভাগ্যখারাপ হলে তার কোনো অবস্থাতেই ভালো কিছু হয় না
 “দশ চক্রে ভগবান ভূত”--- চাপে পরে অন্যায়কেও প্রশ্রয় দেওয়া বা সৎকেও মিথ্যা করা ।
 “দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ”--- সবাই মিলে মিশে
 কাজ করলে ফল না পেলেও ক্ষতি নেই ।
 “দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো”---খারাপ কিছু থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো ।
 “ধর্মের ঢাক আপনিই বাজে”---যা সত্য তা একদিন প্রকাশ পাবেই ।
 “ধান ভানতে শিবের গ্লীত”--- অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা করা ।
 “নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা”---নিজের দোষের জন্য অন্যকে দায়ী করা ।
 “নেই মামার চেয়ে কানা মামাও ভালো”--- একেবারে কিছুই না পাওয়া অপেক্ষা সামান্য কিছু পাওয়াও ভালো ।
 “লাভের গুড় পিঁপড়ের খায়”--- অসৎ উপায়ে অর্জিত ধন অকাজে নষ্ট হয় ।
 “পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে”--- অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলা ।
 “পেটে খেলে পিঠে সয়”--- লাভের সম্ভাবনা থাকলে কষ্টও সহ্য করা যায় ।
 “বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর”--- মালিকের অনুপস্থিতিতে কাজে ফাঁকি দেওয়া । “ভিক্ষার
 চাল কড়া আর আকীড়া”---অন্যের দয়া করে দেওয়া জিনিসের দোষ গুণ বিচার
 না করা ।
 “মরা হাতি লাখ টাকা”---গুণী লোক অসুস্থ হয়ে পড়লেও সবার শ্রদ্ধেয় ।
 “শক্তের ভক্ত, নরমের যম”---শক্তিমানকে ভয় করা অথচ দুর্বলের অপর অত্যাচার করা
 “শাক দিয়ে মাছ ঢাকা”---কোন খারাপ কাজকে গোপন করার জন্য অন্য কোনও ভালো কাজের ভাণ করা ।
 “সবুরে মেওয়া ফলে”---ধৈর্য ধরে থাকলে ফল পাওয়া যায় ।
 “সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না”--- ভালো কথায় কাজ হয় না ।
 “হাতে পাঁজি মঙ্গলবার”--- প্রত্যক্ষভাবে জানার উপায় থাকলে অনুমানের ওপর নির্ভর না করা ।

অনুশীলনী- ৩

১) নিচে দেওয়া প্রবাদগুলি থেকে বেছে শূন্য স্থানে উপযুক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করুন ।
 উত্তর করা হয়ে গেলে উত্তর সংকেত দেখুন ।

ক) তুমি তো আগেই অনেক টাকা পেয়েছ? আরো লাভ করতে গিয়ে বিপদে পড়লে তো? -----
-----!

খ) রমেন তো আমাদের গ্রামের ছেলে তাই ওর পাণ্ডিত্যকে কেউ আমল দেয় না।-----

গ) যতক্ষণ মালিক উপস্থিত থাকেন ততক্ষণই কর্মচারীরা কাজ করে। এ যেন-----
-----।

ঘ) বকাবকি করলে আর কী হবে? বিপদে-আপদে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্যও তো করেন!-----
-----।

ঙ) ক্ষতিশবাবু এতক্ষণ চেষ্টামেচি করছিলেন অথচ ছেলে বাড়ি আসতে কিছুই বললেন না! আসলে-----
-----।

চ) কালোবাজারী করেই তো এই ঘরবাড়ি করেছে! এখন বলছ শ্বশুরবাড়ি থেকে
দিয়েছে!.....!

ছ) এসেছি মায়ের কাছে দু-দিন জিরোতে, এখানেও সেই কাজের
চাপ!.....।

জ) উপরওয়ালার কথা শুনতেই হবে! যায়?

৩.৮ উত্তর সঙ্কেত

অনুশীলনী ১:

- ক) (৪)চোখ রাঙানোয়
- খ) (২) মাটি করে
- গ) (৪) মাথা খেয়েছ
- ঘ) (১) মুখে আনতে
- ঙ) (২) কাটতে চায়
- চ) (৪) কাঁচা কাজ
- ছ) (২) পাকা দেখা
- জ) (১)মোট টাকা
- ঝ) (৪) কাটে
- ঞ) (২) হাত পাকিয়েছে
- ট) (২) কাঁচা পয়সা
- ঠ) (৩) বুদ্ধি

ড)(৪) সাক্ষাৎ

অনুশীলনী ২:

১। ক) মগের খ)দুলাল গ)কান ঘ)পাঁচ ঙ)সেলামী চ)নড়া ছ) করাত জ) সোনায় ঝ) অরণ্যে ঞ) ধার্মিক ট) অমাবস্যার ঠ)ছাইচাপা

২। ক)দুর্লভ দর্শন খ) হঠাৎ ধনী গ)তোষামোদকারী ঘ)পরাধীন চাকুরে ঙ)অকর্মণ্য চ)বুঝে উঠতে পারা ছ)একমাত্র বংশধর জ)কঠোর পরিশ্রম ঝ)গুপ্ত বিষয় প্রকাশ ঞ)ভণ্ড

অনুশীলনী ৩:

প্রবাদ-প্রবচন বিষয়ক:

ক) অতি লোভে তাঁতি নষ্ট
খ) গৈয়ো যোগী ভিখ পায় না
গ) বামন গেল ঘর, লাঙল তুলে ধর
ঘ) পেটে খেলে পিঠে সয়!
ঙ) যত গর্জে তত বর্ষে না
চ) শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না
ছ) টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে
জ) জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ব্লক ১, একক ৪ : বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : প্রাচীন ও মধ্যযুগ

BL-1 Unit-4

১.৪.০ উদ্দেশ্য

১.৪.১ প্রস্তাবনা

১.৪.২ মূল পাঠ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

১.৪.৩ প্রাচীন যুগ

১.৪.৪ মধ্য যুগ

১.৪.৫ সারাংশ

১.৪.৬ নির্বাচিত পাঠ্য

১.৪.৭ উত্তর সংকেত

১.৪.০ উদ্দেশ্য :

এককটি পাঠ করার পর আপনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন। এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের রচনাগুলি সম্পর্কেও সুস্পষ্ট রূপে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

১.৪.১ প্রস্তাবনা :

প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বাংলার জন্ম হল ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর থেকেই বাংলা ভাষাকে বাহন করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সূত্রপাত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রধানত তিনটি যুগে বিভক্ত। প্রাচীনযুগ,

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। এর মধ্যে আমাদের আলোচনার বিষয় হল প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। প্রাচীন বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম সাহিত্যের নাম হল চর্যাপদ। সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকরা এই কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা ছিলেন। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়কালে বাংলার বুকে নেমে এলো তুর্কী আক্রমণ। সাহিত্যচর্চার কাজটি হল বিঘ্নিত ও বাধাপ্রাপ্ত। তুর্কী আক্রমণের ঝড় থেমে গিয়ে সমাজ শান্ত হলে বাংলা ভাষা মধ্যযুগে পদার্পণ করল। তখন প্রথমেই লেখা যে সাহিত্যটি আমাদের হাতে আসে সেটি হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বড়ু চণ্ডীদাস এই গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। এরপর যে সাহিত্যধারায় বাংলা সাহিত্য রচনা চলতে থাকে, তার মধ্যে অন্যতম হল অনুবাদ সাহিত্যের ধারা। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বাংলা ভাষায় অনুবাদ হল। এ বিষয়ে যে তিনজন বাঙালি কবি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে কৃষ্ণিবাস ওঝা, মালাধর বসু এবং কাশীরাম দাস। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি অতি জনপ্রিয় শাখা হল মঙ্গলকাব্য। গৃহস্থ ঘরে এই কাব্যের খুব কদর ছিল। এর মধ্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল কাব্য লোকসমাজে আদৃত হয়। মধ্যযুগের শেষ বড় কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের নামও এ প্রসঙ্গে করে রাখতে হবে, কারণ আসলে তাঁর এই কাব্যটি ছিল মঙ্গলকাব্য ধারার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভারতচন্দ্র যেহেতু ব্যতিক্রমী কবিব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, সুতরাং তাঁর কাব্যে মঙ্গলকাব্যের বাহ্যিক কাঠামোটি অনুসৃত হলেও এর খোলনলচে ছিল সম্পূর্ণই আলাদা। আসলে তিনি আধুনিক জীবনধারাকে কাব্যে অঙ্গীভূত করে নতুন ভঙ্গিতে মঙ্গলকাব্য লিখে মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৈষ্ণবকাব্য বা বৈষ্ণব পদাবলী হল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সেই স্রোত যা বাংলা কবিতায় গীতিকবিতার ছন্দকে নিয়ে আসে। আধুনিক যুগের বহু জনপ্রিয় কবি-মনে এর পৃথক আবেদন রয়ে গেছে। এমনই শক্তিশালী কাব্যধারা এই বৈষ্ণব পদাবলী। চৈতন্যপূর্ব ধারায় তত্ত্বকে বাদ দিয়ে শুধু ভক্তের আবেদন নিয়ে যাঁরা বৈষ্ণব পদাবলীর পদ রচনা করেন তাঁদের মধ্যে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের নাম করা যায়। চৈতন্যদেবের জন্ম পরবর্তীতে মহাপ্রভুর ধর্মমতের সমর্থনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ওপর ভিত্তি করে যাঁরা বৈষ্ণব পদাবলীর পদ রচনা করেন এবং প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তাঁরা হলেন জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের মতো ভক্তসাধক। এছাড়াও বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় জীবনীসাহিত্য রচনার সূত্রপাতও হয়েছিল এই মধ্যযুগেই চৈতন্যদেবের জীবন ও সাধনা এবং ধর্মমত নিয়ে বাংলা ভাষায় একাধিক গ্রন্থ রচনা হয়েছিল, যার মধ্যে আদি গ্রন্থ বলা যেতে পারে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতকে। জয়ানন্দ এবং লোচনদাসের

চৈতন্যমঙ্গলের নামও আলাদা ভাবে করা যায়। তাছাড়া যে কবি চৈতন্য জীবনীসাহিত্যকে সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যের মান্যতা এনে দেন তিনি হলেন শ্রীশ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তাঁর চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থটি গোটা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেরই শুধু নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই এক অতি মূল্যবান গ্রন্থ। বৈষ্ণব পদাবলীর পাশাপাশি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীশক্তির আরাধনা করে যে পদ সাধক রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের অস্থির সমাজব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে লিখেছিলেন, তার নাম শাক্ত পদাবলী। এরপরে যে বিশেষ বাংলা সাহিত্যের কথা বলতে হয় সেটি হল আরাকান রাজসভার সাহিত্য। দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওলের মতো কবিরা লোরচন্দ্রানী বা পদ্মাবতীর মতো কাব্যের বাংলা অনুবাদ করে নরনারীর প্রণয়োপাখ্যানের স্রোতকে কাব্যে বহতা দিয়ে বাঙালি পাঠকদের ভিন্ন স্বাদের সাহিত্য উপহার দেন। এরপর কবিগান, হাফ-আখড়াই, তরঙ্গ গান, ময়মনসিংহ গীতিকা, বাউলগীতির ধারা পার হয়ে ১৭৬০ সালের পরবর্তী সময়কালে বাংলা সাহিত্য আধুনিক যুগে পদার্পণ করে।

১.৪.২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। এক সংহত সমাজব্যবস্থায় সামাজিক, রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক বদলকে সাহিত্য নিজ অঙ্গে ধারণ করে থাকে। সমাজের সাথে সাথে সাহিত্যও তাই প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য আসলে সমাজবদলের সাক্ষ্য বহন করে। ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের এই ব্যাপ্ত সময়কালে বাংলার রাজনীতিতে একের পর এক শাসকের বদল ঘটে গেছে। সাধারণ মানুষের জীবনচর্যায়ও তার প্রভাব পড়েছে অবধারিত ভাবেই। ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ পর্বের বাংলাদেশের লিখিত ইতিহাসের প্রমাণ যেহেতু সহজলভ্য নয়, তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল রূপে গৃহীত হতে পারে। নিছক সাহিত্যিক তাৎপর্যের পাশাপাশি এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও নেহাত কম নয়। বাংলা সাহিত্যের এই ইতিহাস বাঙালি জাতি এবং বাংলা দেশের এক সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যকে নিজের মধ্যে নিহিত করে রেখেছে। এবং সেই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও অভিনিবেশ দাবী করে। আধুনিক মন ও মননের

সম্বন্ধে নতুন ভাবে বিচার বিশ্লেষণ দ্বারাই সাহিত্যের ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারা যাবে।

১.৪.৩ বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : প্রাচীন ও মধ্যযুগ –

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ –

প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বাংলার জন্ম হল ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর থেকেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সূত্রপাত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রধানত তিনটি যুগে বিভক্ত। প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। এর মধ্যে আমাদের আলোচনার বিষয় হল প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ –

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনযুগের সময়সীমা মোটামুটিভাবে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাচীনযুগের প্রামাণ্য সাহিত্যিক নিদর্শন হল চর্যাপদ। মনে করা হয়, এই গ্রন্থের মধ্যে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এটিই হল প্রাচীনতম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে ১৯০৭ সালে ‘চর্য্যচর্য্যবিনিস্চয়’-এর পুঁথি আবিষ্কার করেন। পরে ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ‘হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা’ নামে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

এটি ছিল কাব্যগ্রন্থ। এখানে সর্বমোট চব্বিশজন কবি মিলে পঞ্চাশটি পদ রচনা করেন। তবে তিনটি পদ সম্পূর্ণত ও একটি পদ আংশিকভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চর্যাপদের মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে। চর্যাপদের কবিরা ছিলেন লুইপা, কাহুপা, ভুসুকুপা, শবরপা, সরহপা, ডোম্বীপা প্রমুখ। এঁরা সবাই ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের সাধক। চর্যাপদ ছিল এঁদের সাধন-ভজনের রীতিনীতি সমন্বিত পুস্তক। এই কবিরা অধিকাংশই ছিলেন বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও কামরূপের অধিবাসী। এই চর্যার ভাষা যেহেতু সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যায় না, তাই পণ্ডিতজনেরা একে ‘সন্ধ্যা ভাষা’ নাম দিয়েছেন, সন্ধ্যা ভাষা-- অর্থাৎ যে ভাষা রহস্যময়, অস্পষ্ট। চর্যাপদের কবিতাগুলিতে একদিকে যেমন সাধনতত্ত্বের কথা উঠে এসেছে, অন্যদিকে

তেমনি এর বহিরঙ্গে ধরা পড়েছে বাংলাদেশের তৎকালীন সমাজচিত্র ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ। সে দিক থেকে চর্যাপদের ঐতিহাসিক মূল্য আরো বেড়ে যায়। সেকালের বাংলার ভৌগোলিক বিস্তৃতি, নদীনালা, জঙ্গল ও পর্বত সমন্বিত ভূভাগ ইত্যাদির কথা চর্যাপদের কবিতায় যেমন এসেছে, তেমনি সেকালের সমাজজীবনের বর্ণাশ্রম প্রথা ও অস্পৃশ্যতা, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের নগরের বাইরে অরণ্যসঙ্কুল পরিবেশে অবস্থান ইত্যাদির কথাও এই গ্রন্থে ধরা পড়েছে। সমাজের নিম্নশ্রেণীর জীবনের ওপরেই চর্যাপদগুলি তুলনামূলকভাবে বেশি আলোকপাত করে। বাঙালীর একান্নবর্তী সংসারের চিত্র, নাটক, বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যগীতের প্রতি আকর্ষণ, পুরুষের মদ্যপান ও তাস-পাশা খেলার বিনোদন, নারীর অলঙ্কারপ্রিয়তা, সমাজে বরপণের প্রথার অবস্থান ইত্যাদি নানা বিষয়ের কথা জেনে নেওয়া যায় চর্যাপদ থেকে। নারীরা সেকালে দৈহিক শ্রমের কাজে যোগ দিত, সমাজে ব্যভিচার ছিল, উচ্চবর্ণের লোকে নিম্নবর্ণের ওপর নানাবিধ অত্যাচার করত – এইসব সামাজিক সত্যও চর্যাপদের নিবিড় পাঠে উদ্ভাসিত হয়।

অর্থাৎ দেখা গেল, চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এক ও অন্যতম সাহিত্যিক নিদর্শন। এটি বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকেও নিজ অঙ্গে ধারণ করে রয়েছে। চর্যাপদ সেযুগের বাংলাদেশের সমাজ-ইতিহাসের দলিলও বটে। সুতরাং সকল যুগে, সকল কালে বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও সুদূরপ্রসারী।

১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে তুর্কী আক্রমণ বিধ্বস্ত সময়কালে কোনো সাহিত্যের সাক্ষর পাওয়া যায় না। তাই এই সময়কালকে অনেকে অন্ধকার যুগ বলেন। তাই এর পর সরাসরি চলে যাওয়া যায় মধ্যযুগে।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ –

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের পরে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কথা আসে। এই যুগের সময়সীমা ছিল মোটামুটি ভাবে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল অর্থাৎ প্রায় ৪০০ বছর। এই ব্যপ্ত সময়কালকে, ভাষার পরিবর্তনের চিহ্নের ওপর ভিত্তি করে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকেরা। আদিমধ্য বাংলা ভাষার যুগ ও অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার যুগ।

সুতরাং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দুটি ভাগ রয়েছে। আদিমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য।

আদিমধ্য বাংলা ভাষার যুগের সময়সীমা ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে নাম করা যায় বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের’। তুর্কী আক্রমণের পরে বিধ্বস্ত জনজীবনের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে এই কাব্য। এই কাব্যের মূল উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এই গ্রন্থটি বাংলায় রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। মধ্যবাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন এই গ্রন্থটিতেই পাওয়া যায়। সেদিক থেকেও বইটির গুরুত্ব কম নয়। অবশ্য এ বইটির অস্তিত্ব আমাদের অনেক দিন পর্যন্ত জানা ছিল না।

১৯০৯ সালে শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্ল্যা গ্রাম থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে পুঁথিটি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। আবিষ্কারের সময় এই গ্রন্থের প্রথম, মধ্য ও শেষদিকের কিছু পাতা পাওয়া যায়নি বলে আবিষ্কর্তা স্বয়ং এই গ্রন্থের নামকরণ করেন ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। পরে পুঁথির মধ্যে একটি চিরকুট পাওয়া যায় যাতে লেখা ছিল ‘শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ’ নামটি। হয়ত এটিই ছিল কাব্যের প্রকৃত নাম, কিন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নামটিই বহুল প্রচারিত হয়ে যাওয়ায় সেটি আর বদলানো হয়নি।

পুঁথিটি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায় বলে কবির আত্মপরিচয় জানা না গেলেও, মনে করা হয় তিনি ছিলেন বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামের লোক। প্রাপ্ত পুঁথিটি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সম্ভবত লেখা হয়। এটি চৈতন্যপূর্ব যুগের রচনা। কারণ চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভাবাদর্শ এর কাহিনীতে ছায়াপাত করেনি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছিল মূলত নাটগীতি জাতীয় রচনা। এর কাহিনীতে আখ্যায়িকা, গীতিকাব্য ও নাট্যরসের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের এই কাব্য রচনায় জয়দেবের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য ‘গীতগোবিন্দ’, ভাগবত জাতীয় কৃষ্ণকথা বিষয়ক রচনা ও লোকসমাজে প্রচলিত গল্পকথার একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল।

এই কাব্যের তেরোটি খন্ড ছিল, যেমন – জন্মখণ্ড, দানখণ্ড, হারখণ্ড, নৌকাখণ্ড ইত্যাদি। তিনটি প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াইয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কাহিনীর অগ্রগতি ঘটেছে।

কৃষ্ণচরিত্রে সামঞ্জস্য রক্ষিত না হলেও, ‘রাধা’ চরিত্রচিত্রণে কবি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। বড়ই চরিত্রও বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করে। কাহিনীতে সেকালের সমাজজীবনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হলেও, কাব্যবিচারে বলা চলে এটি ছিল সেকালের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।

অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নানা শাখায় বিভক্ত। এর মধ্যে প্রথমেই বলা যায় বৈষ্ণব পদাবলির কথা। রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক সংক্ষিপ্ত কবিতাকে পদ বলে আর এই পদের সমাহারই হল পদাবলী। যে সংক্ষিপ্ত কবিতায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা বর্ণিত হয় তাকে বৈষ্ণব পদাবলী বলা হয়। বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাসে এর অবদান অনস্বীকার্য। শ্রীচৈতন্য জীবনকে(১৪৮৬-১৫৩৪) ধরলে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্যোত্তর বা চৈতন্য পরবর্তী ধারা। চৈতন্যপূর্ব যুগের কবিরা ব্যক্তিগত ভাবকল্পনার আবেগে কবিতা লিখেছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর পদকর্তারা সবাই ছিলেন বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত সাধককবি। এঁরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমসম্পর্কিত পদ লিখেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে।

চৈতন্যপূর্ব যুগের দুজন বিখ্যাত কবি হলেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। কবি বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার বাসিন্দা। তিনি পদ লিখেছেন মৈথিলি ভাষায়। তিনি সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। মৈথিলিভাষা ও বাংলাভাষার মিশ্রণে ব্রজবুলি নামক এক কৃত্রিম কাব্যভাষার জন্ম হয়। বিদ্যাপতির পদগুলি এই ব্রজবুলি ভাষাতেই বাংলাদেশে পাওয়া যায়। ‘কবিসার্বভৌম’ বিদ্যাপতি জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ দ্বারা অধিকমাত্রায় প্রভাবিত হয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমপদ রচনা করেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের এই পণ্ডিত কবিত্ব, রচনারীতি, বৈদগ্ধ্য, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, ভাষার কারুকার্য দ্বারা পদগুলিকে অপরূপ রূপসৌন্দর্য দান করেন। রাজসভার কবি বিদ্যাপতির পদে রাজসভার ঐশ্বর্যের আড়ম্বর, আভিজাত্যের জৌলুষের পাশাপাশি জীবনের বহিরঙ্গের সম্ভোগকামনা ও দেহবর্ণনার আতিশয্যও স্থান করে নিয়েছিল। রাধাকৃষ্ণের রূপকে তাঁর পদে রক্তমাংসের নরনারীর প্রণয়কথাই প্রাধান্য বিস্তার করে। তিনি ছিলেন শৃঙ্গাররসের কবি। প্রেমে মিলনের তীব্রতার সঙ্গে বিরহের আর্তিও বিদ্যাপতির পদে গভীরভাবে ধরা পড়ে। তবে মানবিক অনুভূতি ধীরে ধীরে অপার্থিব জগতের দিকে নিয়ে যায় পাঠককে। এখানেই বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন হয়।

চন্ডীদাসের কবিপ্রকৃতি ভিন্ন। ইনি ছিলেন বীরভূম জেলার নানুর গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পদে রাধার প্রেম গভীরতম জীবনবোধের নির্যাস, অস্মিতা-বিলোপের সাধনা। কৃষ্ণকে পাওয়ার সাধনায় রাধা দুঃসহ তপস্যার মধ্যে ভূমানন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছে। চন্ডীদাসের রাধাচরিত্রে ক্রমবিকাশ নেই। সে যেন ‘যৌবনে যোগিনী’। মিলনের মধ্যেও রাধা বিরহই প্রত্যক্ষ করে। অনবদ্য এই চরিত্র সৃষ্টির জোরেই চন্ডীদাস অপরাপর কবিদের থেকে আলাদা হয়ে যান। বাংলাদেশের কবি চন্ডীদাসের ভাষাভঙ্গিমা, ছন্দপ্রকরণ, বাকরীতি সাদাসিধে। সহজ ভাষায় কবি গভীর ভাবের সন্ধান দিয়ে যান। সারল্য ও আন্তরিকতার বন্ধনে পাঠককে বেঁধে চন্ডীদাস ইন্দ্রিয়াতীত ও রহস্যময় সূক্ষ্মতম চেতনার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তাঁর কবিতায়।

চৈতন্যোত্তর ধারার জনপ্রিয় বৈষ্ণব পদকর্তা হলেন জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে এঁদের আবির্ভাব হয়েছিল। জ্ঞানদাসের ভণিতায়ুক্ত প্রায় চার’শ পদ পাওয়া গেছে। তিনি বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনা করেন। তবে বাংলা পদগুলিই অধিক জনপ্রিয় ছিল। রচনারীতিতে মিলের কারণে তাঁকে চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হত। জ্ঞানদাসের পদের প্রকাশরীতিতে ভাষার সরলতা ও ভাবের গভীরতা লক্ষণীয়। জ্ঞানদাস ছিলেন মিস্টিক ও রোমান্টিক কবি। তাঁর পদে আধ্যাত্মিক অনুভূতির সঙ্গে মানবিক চেতনার সমন্বয়সাধন পরিলক্ষিত হয়।

গোবিন্দদাস ছিলেন চৈতন্যোত্তর ধারার বৈষ্ণব পদাবলীর এক অতি পরিচিত নাম। তিনি বিদ্যাপতির লেখনীকে অনুসরণ করে পদরচনা করেন। তাই তিনি বৈষ্ণব কবিসমাজে ‘দ্বিতীয় বিদ্যাপতি’ নামে খ্যাত ছিলেন। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষাকে আত্মস্থ করে তার সঙ্গে চৈতন্যযুগের ভাবাদর্শকে মিশিয়ে এক অভিনব গীতিধারা সৃষ্টি করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ পদসমূহ অধিকাংশই ব্রজবুলি ভাষায় লেখা। বাকমাধুরী, চিত্রকল্প, ছন্দের কারুকৃতি, আবেগের উল্লাস, সঙ্গীতধর্মের মিশ্রণে বিদ্যাপতির পদগুলি হল এক অনুপম সৃষ্টি। গোবিন্দদাসের ‘রাধা’ চরিত্রে দেহের বর্ণনার সঙ্গে রয়েছে হৃদয়ের অতল রহস্যব্যঞ্জনা। এজন্যই গোবিন্দদাসের পদ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। এছাড়াও হিন্দু-মুসলমান অনেক কবির বাংলায় বৈষ্ণব পদ লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

এবার দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে চৈতন্য জীবনীকাব্যের দিকে। ভক্তকবি চৈতন্যদেবের পবিত্র জীবনকাহিনী অবলম্বনে কবিরা যে কাব্য রচনা করেন, তাই চৈতন্য-জীবনীকাব্য নামে খ্যাত। এগুলি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

এর মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করা যায় বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবতে’র। চৈতন্য-জীবনীকাব্য রচনার জন্য বৃন্দাবন দাসকে বৈষ্ণবসমাজে ‘চৈতন্যলীলার ব্যাস’ বলে সম্মান দেওয়া হয়েছে। তাঁর রচিত কাব্যের নাম আদিতে ছিল ‘চৈতন্যমঙ্গল’। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের পরে এর রচনা সম্পূর্ণ হয়। তিন খন্ড বিশিষ্ট এই কাব্যে একান্নটি অধ্যায় ছিল। এই কাব্যে চৈতন্যের বাল্য ও কৈশোরলীলা বাস্তবসম্মত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থে শুধু মহাপুরুষের জীবনালেখ্য লেখা হয়নি বরং সমসাময়িক গৌড়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক চিত্রও জীবন্ত হয়ে ওঠে। সাহিত্যের এই বিশেষ ধারায় একটি বিশেষ নাম হলেন শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ। সাহিত্যে মননের ভাষা, দার্শনিক প্রকাশভঙ্গিমা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ভঙ্গিমায় তিনি ভক্তপাঠকের মন জয় করে নেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হল সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই একটি অনবদ্য শ্রেষ্ঠ জীবনীকাব্য। এর রচনাকাল ১৫৬০-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এর তিনটি খন্ড আছে ও অধ্যায় সংখ্যা বাষট্টি। চৈতন্যজীবনের গভীর তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও পরিণাম এবং তারই সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্র, দর্শন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল তত্ত্বকথার বর্ণনাই ছিল কবির প্রধান কাজ। এই বুদ্ধিগ্রাহ্য সূক্ষ্মতত্ত্বের পয়ারত্রিপদীতে ব্যাখ্যা ছিল এক সুকঠিন কার্য। কিন্তু সে কাজও কবি পরম দক্ষতায় সম্পন্ন করেছেন বলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তিনি এক স্মরণীয় নাম হয়ে আছেন।

চৈতন্য-জীবনী সাহিত্য রচনার ধারায় এরপর লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের নামও করা যায়। তাঁরাও নিজ নিজ প্রতিভা অনুযায়ী সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করেছেন।

বাংলার অনুবাদ সাহিত্যের ধারাটিও খুব প্রাচীন। তুর্কী আক্রমণ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ তখন ছিল বর্ণভেদের শিকার। সমাজের উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের বৈষম্যজনিত কারণে অতিক্রান্ত নিম্নবর্ণের মানুষ ধর্মাস্তরণের পথে হাঁটছিল। হিন্দু সমাজপতিরা সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পৌরাণিক হিন্দুর আদর্শকে লোকসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে চেয়েছিলেন এবং তার ফলশ্রুতিতে রচিত হচ্ছিল অনুবাদ সাহিত্য। জীবনে যখন নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব সাহিত্য রচনার অবকাশ রুদ্ধ, তখন অনুবাদের স্রোত বয়ে চলেছে। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে

সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ পাঁচালি, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় এবং কাশীরাম দাশ কৃত মহাভারতের অনুবাদ। এবার এই অনুবাদকর্মগুলির কথা বিস্তারে জেনে নেওয়া যাক।

কবি কৃত্তিবাস ওঝা হলেন বাংলা রামায়ণের আদিকবি। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম হল রামায়ণ পাঁচালী। মহর্ষি বাল্মিকীর সংস্কৃত রামায়ণের এ হল সহজ-সরল ভাষায়, পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে বঙ্গানুবাদ। নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে ছিল কবি কৃত্তিবাসের বসবাস। মনে করা হয় তিনি পঞ্চদশ শতকের কবি ছিলেন। কবি সম্ভবত তৎকালীন গৌড়েশ্বর গণেশের সভাতে যান এবং সেখান থেকেই রামায়ণ অনুবাদকার্যের প্রেরণা পান।

এই রামায়ণ মূল রামায়ণের থেকে কিছুটা আলাদা। এ হল বাঙালি জীবনের মহাকাব্য। বাঙালির মন নিয়ে কাব্য রচনা করতে গিয়ে বাংলার জনজীবন, সমাজ-পরিবেশ, সংস্কৃতিকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন কবি কৃত্তিবাস। তাঁর রামায়ণে মহাকাব্যিক গান্ধীর্যের পরিবর্তে মধ্যযুগীয় বাঙালি পারিবারিক জীবনকথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে করুণরসের প্রাচুর্যের পাশাপাশি বীররস ও হাস্যরসেরও সৃষ্টি হয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে প্রত্যেক বাঙালিই তার হৃদয়ের ছবি স্পষ্ট করে। বাঙালি জনজীবনে এই গ্রন্থের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। তাই মধুসূদন দত্ত বলেছেন, ‘কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি এ বঙ্গের অলঙ্কার’।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের দশম ও একাদশ স্কন্ধ বাংলা অনুবাদ করেন মালাধর বসু। বর্ধমানের কুলীন গ্রামের শ্রী মালাধর বসু নিজের কবিপ্রতিভার গুণে গৌড়েশ্বর রুক্মিণী বরবক শাহের কাছ থেকে ‘গুণরাজ খাঁ’ উপাধি লাভ করেন। ১৩৯৫-১৪০২ শকাব্দের (১৪৭৩-১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ) মধ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের পুঁথিতে কোথাও কোথাও ‘গোবিন্দবিজয়’ বা ‘গোবিন্দমঙ্গল’ নামেরও উল্লেখ আছে। এই ‘বিজয়’ শব্দের অর্থ সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণের গৌরবকাহিনী, শোভাযাত্রা বা মঙ্গলকথা।

মালাধর বসু পুরো ভাগবতের অনুবাদ না করে শুধু দুটি স্কন্ধকে বেছে নেন, যার মধ্যে দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্মকথা থেকে দ্বারকালীলা ও একাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণের তনুত্যাগ ও যদুবংশ ধ্বংসের ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর এই কাব্যগ্রন্থ তত্ত্বভারে ভারাক্রান্ত নয়। সরল পয়ার-

ত্রিপদী ছন্দে ভাগবতের কাহিনী বর্ণনাই কবির মূল কৃতিত্ব ছিল। জনসাধারণের রুচির কথা মাথায় রেখে কোথাও কোথাও বাঙালি ঘরের কথাকেও ভাগবতে গ্রহণ করেন কবি।

চৈতন্যদেব এ কাব্যের অতিশয় প্রশংসা করেন। একে বৈষ্ণব সমাজের প্রবেশক গ্রন্থও বলা হয়। এতে সর্বপ্রথম কৃষ্ণকে ‘প্রাণনাথ’ বলা হয়, যা পরবর্তী যুগের রাগানুগা সাধনার ইঙ্গিতবাহী। সুতরাং সেই বিচারে মালাধর বসু ও তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গুরুত্ব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অপরিসীম বলে ধরে নেওয়া যায়।

অন্ত্যমধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় কৃত্তিবাসের রামায়ণের পরেই উল্লেখ করা হয় কাশীরাম দাশ ও তাঁর মহাভারতের। কাটোয়া মহকুমার সিঙ্গি গ্রামে সম্ভবত ছিল কবির বসবাস। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় কাশীরাম দাশ সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণে মহাভারত রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। কবি সম্ভবত মহাভারতের আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের অনুবাদ করে লোকান্তরিত হন এবং এই কার্য সমাধা করেন তাঁরই বংশের কোনো উত্তরাধিকারী। তবে তাঁরা কেউই কাশীরামের কবিপ্রতিভার সমকক্ষ ছিলেন না। মহাভারতের সংস্কৃত শ্লোক কবি বাংলা পয়ার ত্রিপদীতে রূপায়িত করেন। তবে কখনো কখনো তাঁর কাব্যের ভাষা, শব্দপ্রয়োগ, অলঙ্কার বেশি সংস্কৃত ঘেঁষা বলেও মনে হয়। ফলে মূল সাহিত্য কিছুটা কৃত্রিম হয়ে যায়। কবি মহাভারতের প্রথম চারপর্বে সংক্ষেপে মূল কাহিনীকে অনুসরণ করেন। কোথাও কোথাও কিছু আখ্যান তিনি নিজেই বানিয়ে দিয়েছেন, যা রচনার গুণে কাব্যের অঙ্গ বলেই মনে হয়। কবির বর্ণনা সরস ও গতিযুক্ত হলেও চৈতন্য-উত্তরযুগের রচনা হওয়ায় এতে তৎসম শব্দ, সন্ধি-সমাসের অতিরেক লক্ষিত হয়। কাশীদাসী মহাভারতে বাঙালিয়ানার ছাপ ততটা না থাকলেও কবির বিনয়াবনত বৈষ্ণব মনটি রচনায় অকৃত্রিমভাবেই দেখা দিয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যগুলি আক্ষরিক অনুবাদ ততোটা ছিল না, যতটা ভাবানুবাদ ছিল। এ কথা সকল কবির ক্ষেত্রেই খাটে। এই সাহিত্য আর্থসংস্কৃতি ও বাংলার লৌকিক সংস্কৃতিকে মিলিয়ে দিতে চায়। তাছাড়া হিন্দুসমাজের পুনর্গঠনে ও সর্বভারতীয় প্রাণধারার সঙ্গে বাঙালিজাতির যোগস্থাপনে এই অনুবাদ সাহিত্য ছিল ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ।

মঙ্গলকাব্য হল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি মূল শাখা। এই কাব্যরচনার পেছনে ছিল বিশেষ এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত। পঞ্চদশ শতকের বহিরাক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলাদেশে সাধারণ

মানুষ আশ্রয় খুঁজেছিল পল্লীসমাজের স্থানীয়, আঞ্চলিক দেবদেবী মনসা, ধর্ম, শীতলা, চন্ডীদের কাছে। পৌরাণিক দেবদেবীদের উপাসকরা যাদের ব্রাত্য করে রেখেছিলেন, সেইসব মানুষ কিছু লৌকিক দেবদেবীর বরাভয় মূর্তির শরণাপন্ন হলেন। এই দেবদেবীরাই হলেন মঙ্গলকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং এঁদের নিয়ে রচিত কাব্যই মঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে অধিক জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্য হল মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলকাব্য।

মনসামঙ্গল কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন মনসা। এই কাব্যের অপর নাম পদ্মাপুরাণ। কাব্যের মূল কাহিনীতে দেখা যায় কিভাবে দেবী মনসার পূজা করতে অসম্মত হওয়ায় বণিক চাঁদ সওদাগর মনসার কোপে পড়ে দুরবস্থায় পতিত হন। তাঁর সন্তানদের মৃত্যু হয়। অর্থক্ষতি হয়। শেষে পুত্রবধূ বেহুলার সতীত্ব ও বুদ্ধিমত্তার জোরে দেবী মনসার কৃপায় চাঁদ হারানো ধনসম্পদ ও সন্তানদের ফিরে পান। বেহুলার কথায় তিনি মনসার পূজা করেন, যার ফলে মনসার মাহাত্ম্য উচ্চবর্ণের সমাজে প্রচারিত হয়।

এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেব। বিপ্রদাস পিপলাইও কবিখ্যাতি অর্জন করেছেন। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বরিশাল থেকে ১৩০৩ সালে ছাপার অঙ্করে মুদ্রিত হয়। তাঁর এই কাব্য লোকসমাজে সমাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অন্যান্য চরিত্রে তুলনায় বেহুলা চরিত্রচিত্রণে কবি সমাধিক দক্ষতার পরিচয় দেন। নারায়ণদেবের কাব্য বাংলা ও আসামে প্রচারলাভ করেছিল। ভাষার প্রাচীনত্ব থেকে বুঝে নেওয়া যায় তিনি ছিলেন সময়কালের বিচারে প্রাচীন কবি। সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে তিনি বর্তমান ছিলেন। সুতরাং তিনি ছিলেন বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাইয়ের সমসাময়িক।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চন্ডীর মাহাত্ম্যবর্ণন করা হয়েছে। এর দুটি কাহিনী রয়েছে – প্রথমটি আখ্যটিক খন্ড, দ্বিতীয়টি বণিক খন্ড। আখ্যটিক খন্ডে ব্যাধ কালকেতুর দেবী চন্ডীর আশীর্বাদে ধনদৌলত লাভ, গুজরাট নগরীর পতন এবং কলিঙ্গরাজ ও ভাঁড়দত্তকে পরাজিত করে দেবীর কৃপায় স্বমহিমায় বিরাজ ও চন্ডীর পূজাপ্রচারের কাহিনী বলা হয়েছে। এই কাহিনীটি ঘন ও সংহত। তুলনায় দ্বিতীয় কাহিনীটি কিছুটা শিথিল যেখানে ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয়া স্ত্রী খুল্লনা ও পুত্র শ্রীমন্তের দ্বারা দেবী চন্ডীর কৃপাধন্য হয়ে পূজাপ্রচারের কথা আছে।

চন্ডীমঙ্গলের কয়েকজন জনপ্রিয় কবি হলেন মাণিকদত্ত, দ্বিজমাধব প্রমুখ। তবে এই কাব্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবির নাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যের নাম ছিল ‘অভয়ামঙ্গল’।

এটি রচিত হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে। কবির বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা, চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতা ও জীবনের প্রতি স্নেহমধুর, স্ফুটসুন্দর দৃষ্টি তাঁর কাব্যকে করেছে সুমধুর। তাঁর কাব্যে মঙ্গলকাব্যের পরিচিত কাঠামোর মধ্যে থেকেও চরিত্রচিত্রণে রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-পরিস্থিতি সাহিত্যে ছায়া ফেলেছে। উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ বাস্তবতা ও চরিত্রসৃষ্টি মুকুন্দর সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। তাঁর এই কাব্য উপন্যাসের লক্ষণ বহন করে।

‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যে ধর্মঠাকুরের জয়গান কীর্তিত হয়েছে। এটি প্রধানত রাঢ়বঙ্গের সাহিত্য। এর কাহিনীতে প্রাচীন গৌড়দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। এর দুটি কাহিনী রয়েছে – ১) রাজা হরিশচন্দ্রের গল্প ২) লাউসেনের গল্প। লাউসেনের বীরত্বের কাহিনীই অধিকতর সমাদৃত হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কয়েকজন জনপ্রিয় কবি হলেন ময়ূরভট্ট, রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের ধারায় শেষ নাম রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শেষ বড় কবি। তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই কাব্যগ্রন্থের তিনটি খন্ড ছিল – ১) অন্নদামঙ্গল ২) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ ৩) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর। অন্নদামঙ্গলে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্যকথা বর্ণিত হয়েছে। পৌরাণিক ছাঁদের মঙ্গলকাব্য হলেও এখানে বাংলাদেশের বাস্তব সমাজজীবনের ছবি, নরনারীর সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। এর চরিত্রগুলিও যেন বাংলাদেশের পরিচিত জীবন থেকে উঠে এসেছে। দেবদেবীরা স্বর্গীয় মহিমা ত্যাগ করে মানবগুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। এখানেই কবি ভারতচন্দ্রের অভিনবত্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভোগবিলাসে আচ্ছন্ন কলুষিত সমাজজীবনের চিত্রণই এই কাব্যের মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। তার ওপর রূপদক্ষ কারিগরের মতো কবি কাব্যটিকে শিল্পরূপ দান করেছিলেন। পুরোনো সমাজে দাঁড়িয়ে ভারতচন্দ্র আধুনিক জীবনের ছবি এঁকেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছেন – ‘রাজসভার কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য’।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনার ধারায় আরাকান রাজসভার কবির স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। এর মধ্যে বিশেষভাবে বলা যায় দু’জন কবির নাম – দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল। দৌলত কাজী সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে, আরাকান-রাজ শ্রীসুধর্মার

রাজত্বকালে ‘লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না’ (১৬২১-১৬৩৮ খ্রীঃ এর মধ্যে) রচনা করেন। এটি হিন্দীভাষী কবি মিয়াসাধনের ঠেট-গোহারী ভাষায় লেখা কাব্য ‘মৈনা-কো-সত’-এর বাংলা অনুবাদ। এখানে লোর-চন্দ্রানীর প্রেম ও ময়নামতীর সতীত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দৌলত কাজীর লেখনী ছিল খুব পরিচ্ছন্ন এবং সংযত। এই কাব্যানুবাদে কবি মধ্যযুগের দেবদেবী কেন্দ্রিক সাহিত্যধারা থেকে সরে এসে নরনারীর মিলনগাথা বর্ণনা করেছেন। তাই এটি বিশেষত্ব দাবী করে। কাব্যটির দুই-তৃতীয়াংশ রচনার পরে কবির মৃত্যু হলে পরে এটি সমাপ্ত করেন কবি সৈয়দ আলাওল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ আলাওল এক বিশেষ পরিচিত নাম। তিনি রোসাও বা আরাকান রাজ্যের কবি। সেখানকার রাজা শ্রীচন্দ্রসুধর্মা (থিরি সান্দ থুধম্মা) ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী মাগনঠাকুরের নির্দেশে অনেকগুলি কাব্য বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়াও দৌলত কাজীর কাব্যের শেষাংশ সমাপ্তির দায়িত্বও ছিল তাঁর। কবির অনূদিত গ্রন্থতালিকা হল এরকম – সয়ফুলমলুক-বদিউজ্জমাল, হপ্ত পরকর, তোহফা, সেকন্দারনামা। সৈয়দ আলাওলের প্রসিদ্ধ অনুবাদ কাব্য হল ‘পদ্মাবতী’ (১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এটি হিন্দী-কবি মুহম্মদ জায়সীর ‘পদুমাবৎ’ কাব্য অবলম্বনে লেখা হয়। কবি জায়সীর এই রূপক কাব্যটি আলাওলের কলমে রোমান্টিক-ঐতিহাসিক কাব্যের রূপ পায়। এর মূল বিষয় ছিল সিংহলের রাজকন্যা পদ্মিনী ও চিতোরের রাজা রত্নসেনের প্রেম, বিবাহ, চিতোর-যাত্রা; নারীলালসার বশবর্তী হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর চিতোর আক্রমণ, চিতোরে রানী পদ্মিনীর আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াই ও সর্বশেষে রানীর আত্মহুতি দান। পদ্মাবতীর কাহিনী ও কাব্যগুণের জন্য বাংলার লেখকসমাজে সৈয়দ আলাওল প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য এক অভিনব কাব্যশাখা হল শাক্ত পদাবলী। বাংলাদেশে সর্বশক্তিময়ী দেবী আদ্যাশক্তিকে ভক্তি-বাৎসল্যের দৃষ্টিতে দেখে যে চমৎকার পদসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তাকেই বলা হয় শাক্ত পদাবলী। শাক্তপদে উমা-পার্বতী-দুর্গা এবং শ্যামা মায়ের আরাধনা করা হত। শাক্ত পদাবলীতে ‘আগমনী’, ‘বিজয়া’ ও ‘ভক্তের আকুতি’ পর্যায়ের পদ রচিত হত। আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদে মা মেনকার সঙ্গে বিবাহিতা কন্যা উমার মিলন-বিরহের গাথা রচিত হত। এখানে বাৎসল্য রসই প্রধান রস। ‘ভক্তের আকুতি’

পর্যায়ের পদে পদকর্তা নিজেকে সন্তানসম জ্ঞান করে মাতৃ আরাধনায় রত হতেন। এই শাক্ত পদাবলীর দুজন বিখ্যাত কবি ছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত পদাবলীর আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রামপ্রসাদ সেন। হালিশহরের কুমারহাট গ্রাম ছিল তাঁর নিবাস। তাঁর শ্যামাসঙ্গীতের সংখ্যা তিন শতাধিক। রামপ্রসাদ ভক্ত কবি। নিজেকে শ্যামার চরণতলে নিবেদন করে ভক্তিবিনম্র চিত্তে তিনি পদরচনা করেছিলেন। তাঁর সাধনবিষয়ক পদসমূহে ভাষার সরলতা, ভাবের গভীরতা ও উপমা-রূপকের ব্যবহার দেখা যায়। আধ্যাত্মিকতা, দার্শনিকতা ও গূঢ় তত্ত্বকথার সঙ্গে সমসাময়িক জীবনের বাস্তব জীবনচিত্র তাঁর লেখনীর অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

শাক্ত পদকর্তাদের মধ্যে রামপ্রসাদের পরেই নাম করতে হয় কমলাকান্তের। তিনি ছিলেন বর্ধমান জেলার কালনা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন রামপ্রসাদের অনেক পরবর্তীকালের কবি। কমলাকান্ত ছিলেন কবি, ভাবুক ও শিল্পী। তাই তাঁর গানে ভক্তির আবেগ, সঙ্গীতরস ও পরিমার্জিত শিল্পোৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ‘সদানন্দময়ী কালী’, ‘শুকনো তরু মুঞ্জরে না’, ‘ওরে নবমী নিশি, না হইওরে অবসান’ প্রভৃতি পদগুলি খুব বিখ্যাত।

এভাবেই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় একে একে এসেছে বাউল গান, গাথা ও গীতিকা। তবে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর বছরটিকে, অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দকেই মোটামুটি ভাবে মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের সূচনা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাঙ্কালে বাংলা সাহিত্য নবজন্মজাত গদ্যভাষার হাত ধরে নবরূপে উদ্ভাসিত হয়।

১.৪.৫ সারাংশ

উপরোক্ত আলোচনায় প্রথমেই বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের সাহিত্য হিসাবে চর্যাপদের কথা বলা হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত এই গ্রন্থ সেকালের বাঙালির জীবনচিত্রকে ও তার ভাষার সৌন্দর্যকে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হয়েছে।

এরপরেই আলোচনায় উঠে এসেছে আদিমধ্যযুগের প্রথম সাহিত্যগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা, যার কবি-রচয়িতা ছিলেন বড়ু চন্ডীদাস। এই কাব্য সুন্দরভাবে বাংলা সমাজ-পরিবেশের অঙ্গীভূত করে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণন করে।

অন্ত্যমধ্যযুগের সাহিত্য হিসাবে প্রথমেই বলা হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর কথা। বৈষ্ণব ভাবধারায় পদরচনা করেন চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবি। এই কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পদ লিখলেও তার মধ্যে ব্যক্তিক অনুভূতির প্রতিফলনও লক্ষিত হয়, যা পদাবলী সাহিত্যকে বিশেষ করে তোলে। শাক্ত কবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত দেবী কালিকার উদ্দেশ্যে ভক্তিপদ রচনা করেন, যার আবেদন ছিল অসাম্প্রদায়িক। মধ্যযুগের সাহিত্যের এক নবীনতর সাহিত্যধারা জীবনীকাব্য। চৈতন্য জীবন নিয়ে বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ কাব্যরচনা করেছিলেন।

এখানে আলোচিত হয়েছে অনুবাদ সাহিত্যগুলির কথা, যেখানে একে একে কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই অনূদিত কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এই ছিল যে এগুলি বঙ্গানুবাদ নয়, ভাবানুবাদ ছিল। যার ফলে এই সাহিত্যে কবিমনের স্বতন্ত্র্য কবিকল্পনার স্পর্শ অনুভূত হয়। তাছাড়া নিজেদের কাব্যে কবিরা বাংলার সমাজ-পরিবেশ ও মানব মনস্তত্ত্বের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। ফলত এগুলি একান্তই বাংলার হৃদয়ের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছিল। অনুবাদ সাহিত্যের পাশাপাশি এই আলোচনায় আছে মঙ্গলকাব্য ধারার কথাও। সেখানে প্রথমে মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যকথার পরিচয় প্রদান করা হয়। তার পর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য কিভাবে মঙ্গলকাব্যের পরিচিত কাঠামোর মধ্যে থেকে ‘নূতন মঙ্গল’ ছাঁদে আত্মপ্রকাশ করে, সে কথাও এসেছে।

আলোচ্য রচনাংশে আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে সপ্তদশ শতকে বাংলা সাহিত্যচর্চার যে স্রোত বহমান ছিল, সে কথা বলতে গিয়ে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে দৌলত কাজীর অনূদিত রচনা ‘সতীময়না’ ও ‘লোরচন্দ্রানী’ ও সৈয়দ আলাওলের ‘পদ্মাবতী’-র কথা। এই সাহিত্যে নরনারীর বিরহ-মিলনের গাথার মানবিক আবেদন এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। তাছাড়া এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বাঙালী পাঠককে তৃপ্তিদান করে।

এর পরে বাংলার গাথা-গীতিকা-বাউল গান ইত্যাদি চর্চার উল্লেখ আছে মাত্র, স্বল্পপরিসরে এদের বিশেষ পরিচয় দেওয়া যায়নি। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর বছরটি বিশেষ ভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসবিদদের মতে এই ১৭৬০ এর পরেই বাংলা সাহিত্য প্রাচীন ও মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে।

১.৪.৬ নির্বাচিত পাঠ্য

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনুশীলন - ১

১) নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরে টিক্ চিহ্ন দিন। উত্তর করা হয়ে গেলে নিচে দেওয়া উত্তর সংকেত দেখে মিলিয়ে নিন।

ক) নিম্নলিখিত কোন কবির নাম চর্যাপদের সঙ্গে যুক্ত -

লুইপাদ

চণ্ডীদাস

আলাওল

খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মোট খন্ডের সংখ্যা ছিল -

১০টি

২২টি

১৩টি

গ) মালাধর বসু অপর যে নামে খ্যাত ছিলেন সেটি হল -

কমলাকান্ত

গুণরাজ খাঁ

বীরবল

ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছিল এই জাতীয় রচনা -

নাটগীতি জাতীয়

জীবনী সাহিত্য জাতীয়

গীতিকা জাতীয়

ঙ) রামায়ণের আদিকবি ছিলেন -

কাহ্নপাদ

লোচনদাস

কৃত্তিবাস ওঝা

চ) চর্যাপদের আবিষ্কর্তা ছিলেন -

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বসন্তরঞ্জন রায়

কবি চন্দ্রাবতী

ছ) চর্যার ভাষাকে এক পৃথক নামে নামকরণ করা হয়েছিল এবং সেটি হল -

দোহা ভাষা

সন্ধ্যা ভাষা

সরল ভাষা

জ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম খন্ডের নাম ছিল -

আখোটিক খন্ড

দান খণ্ড

বণিক খন্ড

ঝ) বৈষ্ণব কাব্যধারায় কাকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হত -

বিদ্যাপতি

বলরাম দাস

জ্ঞানদাস

এ৩) ‘লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না’ কাব্যের কবি ছিলেন –

সৈয়দ মুরাদ

দৌলত কাজী

সৈয়দ আলাওল

চ) শান্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা ছিলেন –

জীব গোস্বামী

রামপ্রসাদ সেন

মালাধর বসু

ছ) বৃন্দাবন দাসের লেখা চৈতন্য জীবনীকাব্যের নাম ছিল –

চৈতন্য ভাগবত

চৈতন্য লীলা

চৈতন্য চরিতামৃত

২) নিচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।

ক) ----- সালে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

খ) চর্যাপদের সর্বমোট ----- জন কবি মিলে --- টি পদ রচনা করেন।

গ) শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ----- জেলার ----- গ্রাম থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কার করেন।

ঘ) কবি কৃত্তিবাস ওঝা কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থের নাম ছিল -----।

ঙ) বৈষ্ণব কবিসমাজে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে খ্যাত ছিলেন-----।

চ) তুর্কী আক্রমণের সময়কাল ছিল আনুমানিক ভাবে ----- থেকে ----- এর মধ্যবর্তী সময়কাল।

ছ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি ছিলেন -----।

জ) বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে ----- টি অধ্যায় ছিল।

ঝ) ধর্মমঙ্গল কাব্যে ----- জয়গান কীর্তিত হয়েছে।

ঞ) সৈয়দ আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যটি মুহম্মদ জায়সীর ----- কাব্য অবলম্বনে রচিত হয়।

৩) নিচের লেখা উত্তরগুলি পাঠ করে কোনটি শুদ্ধ ও কোনটি অশুদ্ধ তা নির্দিষ্ট শূন্যস্থানে লিখুন।

ক) চর্যাপদ গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ‘হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। -----

খ) কবি ঈশ্বরগুপ্ত ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছেন – ‘রাজসভার কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য’। -----

গ) কবি বিদ্যাপতি ছিলেন বর্ধমানের বাসিন্দা। -----

ঘ) শাক্ত পদাবলীর ‘আগমনী ও বিজয়া’ পর্যায়ের পদে মা মেনকার সঙ্গে কন্যা উমার মিলন-বিরহের গাথা রচিত হত। -----

ঙ) দৌলত কাজী পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে, আরাকান-রাজ শ্রীরবিধর্মার রাজত্বকালে ‘লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না’ রচনা করেন। -----

চ) কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যভাগবত হল সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই একটি অনবদ্য শ্রেষ্ঠ জীবনীকাব্য। -----

ছ) কবি কাশীরাম দাসের খ্যাতি সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণে বাংলা মহাভারত রচনার জন্য।---

১.৪.৬ উত্তর -সংকেত

- ১) ক) লুইপাদ
- খ) ১৩টি
- গ) গুণরাজ খাঁ
- ঘ) নাটগীতি জাতীয়
- ঙ) কৃত্তিবাস ওঝা
- চ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
- ছ) সন্ধ্যা ভাষা
- জ) আখ্যটিক খণ্ড
- ঝ) জ্ঞানদাস
- ঞ) দৌলত কাজী
- চ) রামপ্রসাদ সেন
- ছ) চৈতন্যভাগবত

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

- ২) ক) ১৯০৭ খ) চব্বিশ ও পঞ্চাশ গ) বাঁকুড়া ও কাঁকিহায়া ঘ) রামায়ণ পাঁচালী ঙ) গোবিন্দদাস
চ) ১২০০ ও ১৩৫০ ছ) কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী জ) একাল্লটি ঝ) ধর্মঠাকুরের ঞ) পদুমাবৎ
৩) ক) শুদ্ধ খ) অশুদ্ধ গ) অশুদ্ধ ঘ) শুদ্ধ ঙ) অশুদ্ধ চ) শুদ্ধ ছ) অশুদ্ধ



ব্লক-১ (পঞ্চম একক)

BL-1 (Unit-5)

উনিশ শতকের বাংলা ঃ সমাজ, সংস্কৃতি এবং আধুনিকতা

গঠন

১.৫.০ উদ্দেশ্য

১.৫.১ প্রস্তাবনা

১.৫.২ সমকাল ও কালীপ্রসন্ন সিংহ

১.৫.৩ হুতোম পাঁচার নকশার ভূমিকা

১.৫.৪ মূল পাঠ ঃ কলিকাতায় চড়ক পার্করণ

১.৫.৫ সারাংশ

১.৫.৬ অনুশীলনী

১.৫.৭ উত্তর সংক্ষেপ

১.৫.১ উদ্দেশ্য-

এই এককটি পড়ে আপনি—

ক) নকশা জাতীয় রচনা বলতে কী বোঝায় তা লিখতে পারবেন

গ) ঐ সময়ে আধুনিকতার দিকে শহর কলকাতা কীভাবে ভাবে এগোচ্ছিল তার

পরিচয় পাবেন

ঘ) কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যশৈলীর বিশেষ কথ্যভঙ্গিটির সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন

১.৫.২ প্রস্তাবনা-

একটি যুগের মধ্য থেকে আরেকটি যুগের জন্ম হয়। কিন্তু এমনটা ভেবে নেওয়া ভুল হবে যে পুরোনা সময়কে রবার দিয়ে মুছে ফেলে নতুন সময়ের আরম্ভ হয়। বোঝার সুবিধার জন্য সাহিত্যের ইতিহাসের প্রবহমানতাকে কিছু মাইল ফলক দিয়ে চিহ্নিত করা হয় বটে, আসলে সেভাবে একটা যুগ থেকে আরেকটি যুগকে আলাদা করে ফেলা যায় না। একটা সমাজের বুকে প্রাচীন অভ্যাস, রীতিনীতি বজায় থাকতে-থাকতেই তার মাঝে থেকে-থেকে নতুন চিহ্নগুলো ফুটে ওঠে। আবার গ্রামের তুলনায় শহরে এই পরিবর্তনগুলো চোখে পড়ে বেশি। শহরে বাণিজ্যিক বা অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণেই নানা মানুষের যাতায়াত। বন্দরগুলোও হয় শহরকেন্দ্রিক। গতিশীল জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত হতে-হতে গ্রামগুলির তুলনায় শহরগুলি পরিবর্তনসমূহকে দ্রুত অঙ্গীকার করে। ঔপনিবেশিক বাংলায় উনিশ শতকেও

তেমনটাই ঘটেছিল। উনিশ শতকের কলকাতা সামন্ততান্ত্রিক বাংলা ও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনক্ষেত্র।

১.৫.৩ সমকাল ও কালীপ্রসন্ন সিংহ

খুব বেশিদিন হয়নি তখন গ্রাম থেকে সদ্য-সদ্য একটি নগরে রূপায়িত হয়েছিল কলকাতা। কলকাতা শহর হয়ে উঠেছিল ইংরেজদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাজ-কর্মের কেন্দ্রভূমি। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব এই কলকাতা শহরের চরিত্র বদলে দিয়েছিল। রাতারাতি অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় প্রথমে কিছু সংখ্যক—পরে দলে-দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছিল। নানা বৃত্তির মানুষজন—খুচরো ব্যবসায়ী, দোকানদার, ‘রাইটার’, মুৎসুদ্দী, ‘পোর্টার’, ‘শিপসরকার’, ‘বুকিং ক্লার্ক’, অন্যান্য কেরাণী, কুলিমজুর, হাইকোর্টে মোকদ্দমা তদ্বির করতে আসা কিছু শিক্ষিত এবং অনেক অশিক্ষিত মানুষ— বিশেষত ভাগ্যসন্ধানী উমেদার, কিছু আর এদের ঘিরে থাকা মোসায়েব আর দালালরা শহর কলকাতাকে সরগরম করে রাখছিল। গ্রাম ছেড়ে সদ্য আসা অনেক সরল মানুষ দালালদের পাশে পড়ে সর্বহারা হয়ে ঘরে ফিরতেন। কুঠিয়াল ইংরেজ কর্মচারী, শহরের হাওয়া খেতে আসা পয়সাওয়ালা গ্রামীণ জমিদার আর হঠাৎ-বড়লোক হয়ে ওঠা ধনীর দুলালদের মনোরঞ্জনকারিণী কিছু বারনারীও তখনকার কলকাতা শহরে ছিলেন। দারোয়ান, পাহারাওয়ালা, উকিল, ডাক্তার, আইনরক্ষক পুলিশ, দারোগা—ঐরাও ছিলেন। একদিকে উচ্চশিক্ষিত বা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাশ্চাত্য আদবকায়দার অনুকরণ—কোথাও সংস্কার আন্দোলনের জয়জয়কার, অন্যদিকে মধ্যযুগীয় পুরাতনী নীতিবোধ, ধ্যানধারণা, অনড়, অটল রক্ষণশীলতা। সংস্কার-আন্দোলনের প্রতি দ্রাকুটি! ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তখনকার কলকাতায় আলোর রোশনাই, জলের কল, পয়ঃপ্রণালী, শহরের চাকচিক্যের পাশে গ্রামীণ অভ্যাস, আচার-আচরণ, লোক-উৎসবের জাঁকজমক; তারই পাশে আধুনিক হয়ে ওঠার প্রাণপণ প্রচেষ্টা—এ-সব লক্ষণ তখনকার কলকাতার অঙ্গে জড়িয়ে ছিল। কোথাও বা ‘সেকেলে’ অজুহাতে পুরোনো সব রকম সংস্কার বর্জনের হুড়োহুড়ি। কোথাও ঠাট্টা-ব্যঙ্গ-বিদ্রোপের মধ্য দিয়ে সেই প্রবণতার নিন্দা। কালীপ্রসন্ন সিংহ(১৮৪০-১৮৭০) ছিলেন জোড়াসাঁকোর ধনী সিংহ পরিবারের পালিত পুত্র। পণ্ডিতবর্গের সাহায্যে বাংলায় মহাভারতের অনুবাদ তাঁর বিশেষ অবদান। তেরো বছর বয়স থেকে ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’ ও রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা, পত্রিকা সম্পাদনা, পুস্তক রচনা প্রভৃতি কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। শিক্ষাপ্রসারে, জনকল্যাণমূলক কাজে, সংস্কার আন্দোলনে অর্থদানের মতো উল্লেখযোগ্য কাজের পাশাপাশি হুজুগপ্রবণ কালীপ্রসন্ন সিংহের নামে অনেক গালগল্পও প্রচলিত ছিল। ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’(১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড এবং ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশ)গ্রন্থে আধুনিকতার জোয়ার-লাগা সেকালের শহর কলকাতার একটি মিলিত-মিশ্রিত চেহারাকে লেখক শব্দের নকশায় পরিবেশন করেছেন। শহরটির এই বিশেষ চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে-সঙ্গে তখনকার অনেক বিখ্যাত মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি— এমনকী নিজেই নিয়েও লেখক অনেক সময় হাসি-মস্করা করেছেন। উনিশ শতকের কলকাতা শহর ও সেখানে বসবাসকারী বাঙালির ছবি দেখতে হলে হুতোম প্যাঁচার নকশা পড়তেই হবে। নিজেই ‘হুতোম প্যাঁচা’ রূপে প্রতিষ্ঠা করে লেখক তাঁর পাঠককূলকে দিনের নানা সময়ে কলকাতা শহর— বিশেষত রাত্রির কলকাতা কেমন ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনুসৃত এই গদ্যশৈলী কালীপ্রসন্ন-সমসাময়িক অন্যান্য অনেক গদ্যকারদের

থেকে আলাদা হয়ে গেছিল। বস্তুত, উনিশ শতক ছিল সংস্কার আন্দোলনের যুগ। শিক্ষা সংস্কার, সমাজ সংস্কার, ধর্ম সংস্কার—প্রভৃতি নানামুখী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে তাদের প্রকাশ করার গদ্যভাষাও ক্রমশ বদলাচ্ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকদের বাংলা গদ্য চর্চার ভাষা ছিল এক রকম—কিভাবে বাংলা বলা হয়, ইংরাজ কর্মচারীদের শেখাচ্ছিলেন তা শেখাতে গিয়ে তাঁরা যে গদ্য ব্যবহার করছিলেন, সে গদ্য ছিল অনেকটা ভাষাশিক্ষার প্রথম ধাপের গদ্য। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়স্বত্বের ভাষা ছিল অন্যরকম—অনেকটা সংস্কৃত ভেঙে তৈরি করা। রামমোহন রায়ের যুক্তিপূর্ণ তর্কিক ভাষার গান্ধীর্ষের পাশে বিদ্যাসাগরের সঙ্গীতময় সাহিত্যিক গদ্য ছিল আর এক রকমের। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মীয় গদ্যের বিশিষ্টতার পাশে অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞান-নির্ভর গদ্যভাষা আরো নতুন হয়েছিল। কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্র যখন ‘আলালের ঘরের দুলাল’ বা ‘মদ খাওয়ার বড় দায়’ বইতে লেখেন(১৮৫৮)—‘বাবুরাম চৌগোঁপা—নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতিপরা—ফুলপুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মতো—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—একগাল পান—ইতস্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বলিতেছেন, ওরে হরে! শীঘ্র বালি যাইতে হইবে...! হরে বলিল, মোসায়ের যেমন কাণ্ড, ভাত খেতে বসেছিল—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এসেছি!’ (আলালের ঘরে দুলাল) তখন সে-ভাষা আমাদের একেবারেই মুখের ভাষার কাছাকাছি। এর কিছু সময়ের মধ্যেই ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’(১৮৬১) লিখে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর পাঠকদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিলেন। গদ্যভাষা যে এতটাই লঘু, সাবলীল এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত চলিত গদ্য হয়ে উঠতে পারে, তা আমরা জানলাম। প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ধারাবিবরণী প্রকাশ করার উপযুক্ত আটপৌরে মুখের ভাষা এটি। এ ভাষা দৈনন্দিন নারীপুরুষের গল্পগাছা, ছুজুগ, কেচ্ছা, গুজব, ঠাট্টা-তামাশার কিংবা ঝগড়া কিংবা গালিগালাজের ভাষা। মেছুনির ‘ও গামচা কাঁদে’ বা মেয়েদের ‘মাগী যে কী জক্কী’ অথবা ‘মিনসে’, ‘বারফটকা’, ‘রাগে গা গস্ গস্ কচ্ছে’, -এই ধরনের শব্দ, ক্রিয়াপদ বা পদগুচ্ছের ব্যবহার নকশাগুলিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে।—শোভাবাজারে রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেছুনিরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা, পচা মাচ ও লোনা ইলিস নিয়ে ক্রেতাদের—“এ গামচা কাঁদে ভালো মাচ নিবি?” “ও খ্যাংরাগুঁপো মিনসে চার আনা দিবি?” বলে আদর কচ্ছে। ‘আলালী ভাষার চেয়েও এ ভাষা এক কাঠি সরেস!

১.৫.৪ হুতোম প্যাঁচার নকশার ভূমিকা

নকশা—অর্থাৎ স্কেচ। নকশা একধরনের সমাজ-সমালোচনা। লঘু ভাষায়, হালকা চালে, হাস্যরসের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিচরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সামাজিক অবস্থা, অনাচার প্রভৃতিকে তুলে ধরা হয় নকশা জাতীয় রচনায়। প্রহসনের মতো এখানে সংলাপ থাকে না। নকশায় ব্যঙ্গ, ঠাট্টা জোরদার করার জন্য কখনো-কখনো অনেক ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষার ব্যবহারও করা হয়ে থাকে। কালীপ্রসন্নের ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-গ্রন্থটি এই জাতীয় রচনার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

বাংলা সাহিত্যে নকশা জাতীয় রচনা এই প্রথম নয়। সমসাময়িক সমাজ এবং ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ করে এর আগেও নকশা লেখা হয়েছে। সমাচার দর্পণে ‘বাবুর উপাখ্যান’ নামে ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এছাড়া ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কলিকাতা কমলালয়’(১৮২৩) ও ‘নববাবুবিলাস’(১৮২৫) প্রভৃতি লেখা হয়েছিল। উনিশ শতকের বাবুশ্রেণীকে কটাক্ষ করে এছাড়াও বেশ কিছু নকশা লেখা হত। তবে কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রাঞ্জল গদ্যভাষা, প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতা, বর্ণনার অনুপুঙ্ক্ষতা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করার মতো।

একমাত্র টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র এ-বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরী। ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ গ্রন্থে সেকাল-একাল মিলিয়ে উনিশ শতকে কলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালির কৌতূহলোদ্দীপক এক আর্থ-সামাজিক জীবনের ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। পূর্তন শতকের জাতিবিভেদের দূরপন্থে অভ্যাস, পোষাক-আশাক, আনন্দোৎসব, চুরি-বাটপারি, ঘুস, বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে নানাবিধ পরিবর্তনের ছাপ ইত্যাদি কালীপ্রসন্নের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ নকশায় প্রকাশিত হয়েছে। চড়ক, বারোইয়ারি, হুজুক, বুজরুকী, হঠাৎ অবতার, স্নানযাত্রা প্রভৃতি—প্রথম ভাগে আর রথ, দুর্গোৎসব, রামলীলা, রেলওয়ে প্রভৃতি দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে। প্রায়শই দেখা যাবে কোনো একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে হুতোম শহর কলকাতার জনজীবনকে ঐকেছেন। বস্তুত একটি উৎসবের সময়ই শহরকে সবচেয়ে বেশি করে তার দোষগুণ সহ চেনা যায়। হুতোম প্যাঁচার নকশায় লেখক সমাজের খ্যাত-অখ্যাত অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আত্মসমালোচনাও করেছেন। সে-দিক থেকেও গ্রন্থটির মূল্য রয়েছে। ইংরাজি ভাবধারার সংস্পর্শে চলন-বলনে আধুনিক হয়ে উঠছে যে শহর কলকাতা, সেখানে গ্রামবাংলার ‘চড়ক’ উৎসব পালিত হচ্ছে। সেই বর্ণনা এখানে পাওয়া যাবে। চড়কের দু-দিন আগে নীলের ব্রতপালন ও উৎসব হয়। নীলের রাত্রি থেকে চড়কের দিন পর্যন্ত কলকাতা শহরের ‘আমোদ’ এই অংশে বর্ণনা করা হয়েছে।

১.৫.৫. মূল পাঠ ঃ কলিকাতায় চড়ক পার্বণ(অংশ)

কলিকাতা শহরের চার দিকেই ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে, চড়কীর পিঠ সড় সড় কচ্ছে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বাঁটি প্রস্তুত কচ্ছে—সর্বান্তে গয়না, পায়ে নূপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকার সাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরের ছোবান গামচা হাতে বিশ্বপত্র বাঁদা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারির আনন্দের সীমা নাই—আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন!...

ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাঁটা ঝাঁপ! আমাদের বাবুর চারপুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কাণে বিশ্বপত্র গুঁজে, হাতে এক মুঠো বিশ্বপত্র নিয়ে ধুন্তে ধুন্তে বৈঠকখানায় উপস্থিত হল; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবু তারে নমস্কার কল্লেন; মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব পরাশের উপর দিয়ে বাবুর মাতায় আশীর্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন, -
- বাবু তটস্থ!

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজুলো, সূর্যের তাপ হ্রাস হয়ে আসতে লাগলো। সহরের বাবুরা ফেটিং, সেন্স ড্রাইভিং বগী ও ব্রাউহ্যামে করে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্র লোক বা মোসাহেব নিয়ে বেড়াতে বেরলেন, কেউ বাগানে চল্লেন—দুই চার জন সহৃদয় ছাড়া অনেকেই পেছনে মাল ভরা মোদা গাড়ী চল্ল, পাছে লোকে জান্তে পারে এই ভয়ে কেউ সে গাড়ীর সইস কৌচম্যানকে তকমা নিতে বারণ করে দেচেন—কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞাণ, বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন; বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেচেন, খাতির নদারং!—কুতীওয়ালারা গহনার ছক্কড়ের ভিতর থেকে উকী মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কল্লেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজোনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ঢাক বাজতে লাগলো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্ছে, কেহ ভক্তি যোগেহাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটুচ্ছে, প্রায় আধ ঘন্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না; কি হবে! বাড়ির ভিতরে খবর গেলো; গিন্নিরা পরস্পর বিরস বদনে

কোন অপরাধ হয়ে থাকবে বলে একেবারে মাতায় হাত দিয়া বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেরা “বোধ হয়, মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাকবে, সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয়;” এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ কল্লে; অবশেষে গুরু, পুরুত ও গিন্নির ঐক্যমতে বাড়ির কর্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচ জন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে— “মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে,” “ফুল তো পড়ে না”। সন্ধ্যা হয় হয়—বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোশাক পরা, রুমালে বোকো মেকে বেরুচ্ছিলেন—শুনেই অজ্ঞান! কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়ে কাণ্ড বন্দ করা হয় না, অগত্যা পায়নাপেলের চাপ্কান পরে, সাজগোজ সমেতই গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আস্তে দেখে দেউড়ির দরোওয়ানেরা আগে আগে সারগেতে চল্লে; মোসাহেবরা বাবুর সমূহ বিপদ মনে করে বিষণ্ণ বদনেবাবুর পেচোনে পেচোনে যেতে লাগ্লে।...

এ দিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁশোর ঘন্টার শব্দ থাল্লে। সকল পথের সমুদায় আলো জ্বালা হয়েছে। “বেল পুল!” “বরফ!” “মালাই!” চীৎকার শুনা যাচ্ছে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েছে অথচ খন্দের ফিরে যাচ্ছে না—ক্রমে অন্ধকার গাঢ়াকা হয়ে এলো; এ সময় ইংরাজী জুতো, শান্তিপুর্বে ডুরে উড়ুনী আর সীমলের ধুতির কল্যাণে রাস্তায় ছোট লোক, ভন্দের লোক আর চেনবার জো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গরী ও ইংরাজী কথার ফরীর সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় ঢু মেরে মেরে বেড়াচ্ছেন—ঐরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন আবার ময়দা পেসা দেখে বাড়ি ফিরবেন! মেছোবাজারের হাঁড়ি হাঠা—চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোণা গাছির গলি ও আহিরি টোলার চৈমাথা লোকারণ্য—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্ছেন কেউ তাঁরে চিন্তে পারবে না; আবার অনেকে চৈচিয়ে কথা কয়ে, কেশে, হেঁচে, লোককে, জানান দিচ্ছেন যে, “তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস করে থাকেন।”

সৌখীন কুটীওয়াল মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেচেন। পাসের ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার করে বিদ্বেসাগরের বর্ণ পরিচয় পড়্চে। পাল ইয়ার ছোকরারা উড়তে শিখ্চে। স্যাকরারা দুর্গাপ্রদীপ সাম্নে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে। রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েছে, রোকোড়ের দোকানদার পোদ্দার ও সোণারবেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাট্চে। শোভাবাজারে রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেচুনীরা প্রদীপ হাতে করে গুঁচা পচা মাচ ও লোনা ইলিস নিয়ে ক্রেতাদের “ও গামচা কাঁদে ভালো মাচ নিবি?” ও “খ্যাংরা গুঁপো মিলে চার আনা দিবি” বলে আদর কচ্ছে—মধ্যে মধ্যে দু একজন রসিকতা জানাবার জন্য মেচুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্ছেন। রেস্তুহীন গুলিখোর গেঁজেল ও মাতালরা লাটি হাতে করে কাণা সেজে “অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ,” বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্ছে; এমন সময় বাবুদের গাজন তলায় সজোরে ঢাক বেজে উটলো, “বলে ভদ্দেশ্বর শিবো”; চীৎকার হতে লাগলো;...

আজ নীলের রাত্তির! তাতে আবার শনিবার; শনিবারের রাত্তিরে সহর বড় গুলজার থাকে—পানের খিলীর দোকানে বেল লণ্ঠন আর দেওয়াল গীরি জ্বল্চে। ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুর ভুর করে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুল্চে। রাস্তার ধারের দুই-একটা বাড়িতে খেমটা নাচের তালিম হচ্ছে, অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুমুর ও মন্দিরার রুণু রুণু

শব্দ শুনে স্বর্গ সুখ উপভোগ কচ্ছেন। কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্ছে। কোথাও পাহারাওলা এক জন চোর ধরে বেঁদে নে যাচ্ছে—তার চার দিকে চার পাঁচ জন চোর হাসচে আর মজা দেখচে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্ছে, তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়বে তায় দ্রাক্ষপ নাই।

আজ অমুকের গাজোন তলায় চিংপুরের হর। ওদের মাটে সিঙ্গির বাগানের প্যালা। ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালি। আজ্ সহরের গাজোন তলায় ভারি ধূম, -- চৌমাথার চৌকিদারদের পোহা বারো! মদের দোকান খোলা না থাকলেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রি হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকালে শুনবেন যে—"ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটিটি পাচ্ছে না" "পালেদের এক ধামা পেতলের বাসন গেছে ও গন্ধ বেণেদের সর্বনাশ হয়েছে"! আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়—থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি, সন্ন্যাসীর হোররা ও "বলে ভদ্রেশ্বর শিবো মহাদেব" চীৎকার।

এ দিকে গির্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে গ্যালো—বারফটকা বাবুরা ঘরমুখ হয়েছে। উড়ে বামুনরা ময়দার দোকানে ময়দা পিস্তে আরম্ভ করেছে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেছে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাক্তে আরম্ভ করেছে; দু এক বার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন লোক শূন্য। ক্রমে দেখুন—"রামের মা চলতে পারে না", "ওদের ন বৌটা কি বজ্জাত মা", "মাগী যে কী জক্কী" প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে দুই এক দল মেয়ে মানুষ গঙ্গা স্নান কত্তে বেরিয়েছেন। চিংপুরের কসাইরা মটন চাপের ভার নিয়ে চলেছে। পুলিশের সার্জেন্ট, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি গরীবের যমেরা রোঁদ সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যাচ্ছেন; সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট, পরিপূর্ণ—হজুরদের কাছে চালা কাঠখানা, তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না, অনেকের মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গস্ গস্ কচ্ছে, মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেছেন, কাল সকালেই এক জন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কান্দানি ও ক্যারামৎ জাহির করবেন—সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফ্রেণ্ড নিয়তই কাছে থাকে "হারমোনিয়াম" ও "পিয়ানো" বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাটান—সুতরাং ইন্সপেক্টর মহলে একাদশ বৃহস্পতি!!!

গুপস্ করে তোপ পড়ে গ্যাল! কাকগুলো "কা কা" করে বাসা ছেড়ে উড়বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানিরা দোকানের ব্যাপ্তাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হুকোর জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্ছে। ক্রমে ফরসা হয়ে এলো—মাচের ভারিরা দৌড়ে আস্তে লেগেচে—মেচুনিরা ঝকরা কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েছে—বদিবাটির আলু, হাসনানের বেগুণ, বাজরা বাজরা আস্চে। দিসি বিলিতি যমেরা অবস্থা ও রেস্ত মত গাড়ি পালকি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েছেন—জ্বর বিকার ওলাউঠোর প্রাদুর্ভাব না পড়লে ঐদের মুখে হাঁসি দেখা যায় না—উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গোদাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি করে নেছেন; কলিকাতা সহরেও দু-চার গোদাগাকে প্রাক্টিস কত্তে দেখা যায়, এদের অম্বুধ চমৎকার, কেউ বলদের মতো রোগীর নাক ফুঁড়ে আরাম করেন; কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে সারেন। সহরে কবিরাজরা আবার ঐদের হতে এক কাটি সরেশ, সকল রকম রোগেই "সদ্য মৃত্যুশ্বর" ব্যবস্থা করে থাকেন—অনেকে চাণক্য শ্লোক ও দাতা কর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেছেন!

টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরে কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেচে, আজ তাদের বড় ত্বরা, যজ্ঞমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে। আদ বুড়ো বেতারা মর্গিং ওয়াকে বেরুচেন। উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে করে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিক্স, এক্সচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায় উপস্থিত হয়েছে—হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসি না হলে গ্রাহকরা পান না— ইংরাজি কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেকফাস্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যিক। ক্রমে সূর্য উদয় হলেন।

সেকশন লেখা কেরাণির মত কলুর ঘাণির বলদ বদলি হলে, পাগড়ি বাঁধা দলের প্রথম ইন্সটলমেন্টে— শিপসরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপুকর্ম বেরুলেন। আজ গবর্নমেন্টের আফিস বন্দ সুতরাং আমরা ক্লার্ক, কেরাণি, বুককিপার ও হেড রাইটারদিগকে দেখতে পেলাম না। আজ কাল ইংরাজি লেখাপড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধরে আফিসে যান—পাগড়ি প্রায় উঠে গ্যাল— দুই এক জন সেকলে-কেরাণীরাই চিরপরিচিত পাগড়ির মান রেখেছেন, তাঁরা পেন্সন নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের মাথায় পাগড়ি দেখতে পাবো না; পাগড়ি মাথায় দিলে আলবার্ডফেসানের বাঁকা সিতেটি ঢাকা পড়ে এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ম ও পরামাণিকদের পাগড়ি প্রায় থাকে না থাকে হয়েছে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েচে, হাতে কাজ কিছুই নাই, অথচ যে রকমে হকনা চোটাখোর বেণের ঘরে, ও টাকাওয়ালা বাবুদের বাড়িতে একবার যেতেই হবে— “কার বাড়ি বিক্রি হবে”, “কার বাগানের দরকার”, “কে টাকা ধার করবে” তাহারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার বেণে সহরে বাবুরা, দালাল চাকর রেখে থাকেন, দালালেরা শীকার ধরে আনে— বাবু আড়ে গেলেন!

দালালি কাজটা ভাল, “নেপো মারে দইএর মতন” এতে বিলক্ষণ গুড় আছে। অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকে গাড়িঘোড়ায় চড়ে দালালি কত্তে দেখা যায়, অনেক “রেক্তহীন মুচ্ছদী” “চারবার ইনসালভেন্ট”, এখন দালালী ধরেছেন। অনেক পদ্বলোচন দালালীর দৌলতে “কলাগেছে থাম” ফেঁদে ফেললেন— ঐরা বর্ণচোরা আঁব, ঐদের চেনা ভার, না পারেন হেন কর্মই নাই। পেসাদার চোটাখোর বেণে— ও ব্যাভারবেণে বড়মানুষের ছলনারূপ নদীতে বেঁউতি জাল পাতা থাকে, দালাল বিশ্বাসের কলসী ধরে গা ভাসান দে জল তাড়া দেন, সুতরাং মনের মতন কটাল হলে চুনো পুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেল। সহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চার দিকে ঢাকের বাদ্যি, ধূনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকী, সুতোশোণ, সাপ, ছিপ ও বাঁশ ফুঁড়ে একবারে মরিয়া হয়ে নাস্তে নাস্তে কালীঘাট থেকে আসছে।

বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ার গোচের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ, সকের দলের পাঁচালি ও হাপ্ আকুড়ায়ের দোয়ার, গুল গার্ডেনের মেম্বরই অধিক, -- ঐরা গাজোন দ্যাখবার জন্য ভোরের ব্যালা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুঝে বড় মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্ছে। কেউ সিভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন। কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও – “সাত পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড” বলেই চড়কে আমোদ করেন; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা, কি করেন, বড় দাদা, সেজ পিসে বর্তমান— আবার ঠাকুরমার এখনো কাশীপ্রাপ্ত হয় নাই।

অনেকে চড়ক, বাণফোঁড়া, তরওয়াল ফোঁড়া দেখতে ভালবাসেন; প্রতিমা বিসর্জনের দিন পৌত্বের ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোন। অনেকে বুড়ো মিন্বে হয়েও হীরে বসান টুপি, বুকে জরির কারচোপের কর্ম করা কাবা ও গলায় মুক্তার মালা, হীরের কণ্ঠী, দুহাতে দশটা আংটি পরে “খোকা” সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয়ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাট বৎসর— ভাগ্নের চুল পেকে গ্যাছে।

অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ করে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মোৎফরেফ্কার তদ্বির কত্তে হলে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়াগেঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোনা লাগত, এখন লোণা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিষ লেগে থাকে— অনেকে তার দরুণ একবারে আঁতকে পড়েন— ঘাগি গোচের পাল্লায় পড়ে শেষ সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান। দুকুরব্যালা ফেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালী বা চণ্ডীর গানের পেলদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ানো, জন দশ বারো মো-সাহেব সঙ্গে বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোসাক, গলায় মুক্তার মালা— দেখলেই চেনা যায় যে, ইনি একজন বনগাঁর শেয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ— বিদ্যায় মূর্তিমান মা! বিসর্জন, বারোইয়ারি, খ্যামটা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত—মধ্যে মধ্যে খুনি মামলায় গ্রেপ্তারী ও মাহাজনের ডিক্রীর দরুণ গা ঢাকা দেন। রবিবার পাল পার্বণ বিসর্জন আর স্নানযাত্রায় সেজেগুজে গাড়ি চড়ে বেরোন।

পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এইরকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ দুই-একজন জমিদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রসংশা নিয়ে যান। তাঁরা সোনাগাছীতে বাসা করেও সে সঙ্গে বিব্রত হন না; বরং তাঁদের চালচল দেখে অনেক শহুরে তাক হয়ে থাকেন।

আবার কেউ কাশীপুর বোড়স্যা ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে, চব্বিশ ঘন্টা সোনাগাছীতেই কাটান, লোকের বাড়ি চরোয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তার পর দিন প্রিয়তমার হাত ধরে যুগলবেশে জেটা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিশে হাজির হন, ধারে হাতি কেনেন। পেমেন্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গী উপস্থিত হয়—পেড়াপিড়ী হলে দেশে সরে পড়েন, -- সেথায় রামরাজ্য!

জাহাজ থেকে নতুন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে ছেকে ধরে সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড়মানুষ সহরে এলেই প্রথমে দালাল পেস হন। দালাল, বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ি ভাড়া করা, গাড়ির যোগাড় করা, খ্যামটা নাচের বায়না করা, প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটিকেল এজেন্টের কাজ করেন। সাতপুকুরের বাগান, এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম—বালির ব্রিজ, -- বাগবাজারের খালের কলের দরজা—রকমওয়ারি বাবুর সাজান বৈঠকখানা, -- ও দুই এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ি নিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে পারলে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদে যায়, শেষে বাবু টাকার টানাটানিতে বা কর্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেন্টী কর্মে মকবর হন।

আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েচেন, প্রথম দল—‘উঁচু কেতা সাহেবের গোবরের বস্ট’। দ্বিতীয় – ‘ফিরিঙ্গির জঘন্য প্রতিরূপ’। প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিস, পেয়ালা করা চা, চুরোট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাকনি, সালু মোড়া, -- হরকরা, ইংলিশম্যান ও ফিনিশ সামনে থাকে, পোলটিক্স ও বেস্ট নিউজ অব্ দি ডে নিয়েই সর্বদা আন্দোলন। ...সর্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু স্ত্রীর দাস, -- উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একবারে হৃদয় হতে নির্বাসিত হয়েছে; ঐরাই ওন্ড ক্লাস!...

(দ্বিতীয় দল) চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেইরূপ কেবল স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টি করেন। “ক্যামন করে আপনি বড় লোক হব”, “ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাকবে”, -- এই এঁদের নিয়ত চেষ্টি...

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েছে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে পুরে গ্যাছে। নানা রকম বেশ—কারুর কফ ও কলারওয়ালা কামিজ, রূপোর বগলস আঁটা সাইনিং লেদর, কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট, হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গার্ড চেন গলায়, আলবার্ট ফ্যাসানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর রকতাকর বিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই; রাস্তার দু পাশে অনেক আমোদ গেঁড়ে মহাশয়রা দাঁড়িয়েচেন; ছোট আদালতের উকীল, সেকসন্ রাইটর, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে, তেলী, ঢাকাই কামার আর ফলারে যজমেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে দুটি মেয়ে—কারু তিনটে ছেলে।

কোথাও পাদ্রি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচন—কাচে ক্যাটি কৃষ্ট ভায়া—সুবর্ণ চৌকিদারের মত পোসাক—পেনটুলন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙ্গের চোঁঙ্গাকাটা টুপী। আদালতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্ট ধর্মের মহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন পুতুল নাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালার ছেলে ও ফ্রিওয়ালা এক মনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটি কৃষ্ট কি বলচেন্ কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না।...

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেকে ব্রাহ্ম কলসি উচ্ছগু করবেন। এ বারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য বড় ধুম করে কালীপূজা করেছিলেন ও বিধবাবিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেননি। আজকাল ব্রাহ্ম ধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়া কান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোঁটা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ যে বেদ ভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুজতে পারবেন্ না--?

চড়ক গাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেক্সে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েছে। ক্রমে রোদুরের তেজ পড়ে এলে চড়ক তলা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। সহরের বাবুরা বড় বড় ফেটিং ও স্টেট ক্যারেজে নানা রকম পোষাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েচেন, কেউ কাঁসারীদের সঙ-এর মত পালকী গাড়ীর ছাতের উপর বসে চলেচেন—ছোট লোক, বড় মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—বামুন কাএতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন... সন্ধ্যার পর দুগাছী আটা ও একটু ন্যাবড়ানের বদলে—ফাউলকারী ও রোল রুটী ইন্ট্রিউউস হলো। শ্বশুরবাড়ী আহ্বার করা, মেয়েদের বাঁ নাক বেঁধান চলিত হলো, দেখে বোতলের দোকান, কড়িগণা, মাকুঠেলা ও ভালুকের লোম ব্যাচা কলকেতায় থাকতে লজ্জিত হতে লাগলো।

১.৫.৬ সারাংশ ও বোধ

আমরা জানি বাংলার উনিশ শতক সংস্কার আন্দোলনের শতক। কিন্তু উপরে দেওয়া অংশটিতে একটি চড়ক পার্বণকে কেন্দ্র করে সে-সময়কার শহর কলকাতার সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের একটি চলমান ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। ইংরাজি শিক্ষা, সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তখন বাঙালির বেশ-ভূষা, জীবনযাপনে দ্রুত পরিবর্তন আসছিল ঠিকই কিন্তু বাঙালির

চিন্তাচেতনায় তখনো ছিল প্রাচীন-নবীনের মিশেল। পুরোনো শতকের চির পরিচিত অনেক অভ্যাস, রীতিনীতি, বিশ্বাসকে তখনো মানুষ ছাড়তে পারছিল না। অনেক জায়গাতেই গ্রাম-সমাজের অভ্যস্ত রীতি-রেওয়াজ, গ্রামীণ প্রথা, উৎসব, পালাপার্বণ ইত্যাদি চলছিল। লেখক লক্ষ্য করেছেন, মানুষ তাদের এই সব সেকেলে চিন্তা ও বিশ্বাসকে আধুনিকতার মোড়কে ঢেকে রাখতে চাইছিল। নতুন, শহুরে আদব কায়দার পাশে চড়কের মতো গ্রামীণ উৎসব বেমানান, একথা মেনে নিলেও শহুরে বাঙালী 'বাবু' শ্রেণীর লোকেরা এই সব উৎসবকে কেন্দ্র করে জাঁকজমক দেখানোর লোভ সামলাতে পারতেন না। তাই গুরুজনদের মন রাখতেই যেন করতে হচ্ছে -- এই অজুহাত দেখিয়ে উৎসবে মেতে উঠতেন। আর সাধারণ মানুষ – যারা দুটো পয়সা রোজগারের জন্যে শহুরে এসেছেন, তাঁরা তা দেখে মজা পেতেন। ধনীর দুলাল বাবুরাও কিন্তু চড়ক উৎসবে বাগফোঁড়া ইত্যাদি নিষ্প্রের খেলা দেখে 'মজা' উপভোগ করতেন। একটি রাত আর একটি সকালের বর্ণনা এই অংশটিতে রয়েছে। গদ্যাংশটিতে কলকাতার তৎকালীন চলতি মুখের ভাষায় জোড়াসাঁকো এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের(মূলত উত্তর কলকাতা) রাস্তাঘাট, বাজারহাট, গুগার ঘাট, গাড়িঘোড়া, দোকানপাট, ব্যবসাবৃত্তি, চুরিচামারি, মামলা-মোকদ্দমা, জাতপাতের বিভাজন, ঠাট্টা-রসিকতা, দালাল-চক্র, 'বাবু' কালচারের হাল-হকিকৎ, নেশাফুর্তি, খোশামুদে মোসায়েবের দল, পুরোনো এবং হাল ফ্যাসন, পুজো-আর্চা, উৎসব-পার্বণ, ধর্মপ্রচার ও চর্চার রকম-সকম, অফিস-আদালত, সংস্কার আন্দোলনের গ্রহণ-বর্জন, আমোদ-আহ্লাদ-- সকাল, দুপুর, রাত্রির অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা আছে। চড়ক পার্বণে লৌকিক শিবের পুজো হয়। চৈত্র মাসের শেষ দিন এই পার্বণ করা হয়। শোনা যায় বাণ রাজা শিবের কৃপা লাভ করার জন্য নিজেকে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে শিবের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। সেই থেকে লৌকিক বিধি অনুযায়ী ব্রতীরা নিজের গায়ে নানা রকম অস্ত্র—বাণ, দশলকি, কাঁটা ইত্যাদি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে বা জ্বলন্ত কয়লার উপর হেঁটে শিবকে তুষ্ট করার জন্য পুজো করেন। অবশ্যই এটি একটি লোকোৎসব। 'চড়ক' অধ্যায়ে এই রকম একটি উৎসবের বর্ণনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য ভাবধারা, যুক্তিবাদের আধুনিকতার পাশে এই জাতীয় উৎসব-পার্বণ বড়ই বেমানান। সমস্ত বর্ণনাটি থেকে ধরা যাচ্ছে সেই কলকাতাকে, যেখানে সুখসুবিধার আধুনিক জীবন; পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী ধ্যানধারণার দরুণ নব্য শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনে ব্রতী শিক্ষিত দল একদিকে বঙ্গসমাজকে টান দিচ্ছেন সামনে চলার জন্য—ইংরাজি শিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন জগৎ, সতীদাহ রদ, স্ত্রীশিক্ষা, ব্রাহ্মধর্মের প্রসার, বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা—অন্যদিকে এতদিনকার কুসংস্কারের রজ্জুতে বাঁধা পড়ে থাকা একটা শ্লথগতি, আলস্যপর, শোধানবিমুখ, প্রায় পচন ধরা একটা সমাজের একটি অনড় চেহারা। চড়কের আগে শনিবার নীল ষষ্ঠীর রাত। উৎসবের রাতে লণ্ঠন বা দেওয়ালগিরির আলোয় আলোকোজ্জ্বল দোকানপাট। শহর জুড়ে আমোদপ্রমোদের চিহ্ন। তার সঙ্গে জায়গায়-জায়গায় ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি, ছলচাতুরি, চুরিচামারি, পাহারাদার বা শৃঙ্খলা-রক্ষকদের ঘুস নেওয়া—এসব বর্ণনায় তখনকার শহরটা যে খুব সুশৃঙ্খল ছিল না, সে বিষয়টি বেশ টের পাওয়া যায়। এত রকম হৈ-হট্টগোলের মাঝে হঠাৎ-হঠাৎ 'বোলে ভদ্রেশ্বর শিবো' ধ্বনির ওঠাপড়া-- চড়ক কালীন একটি গ্রীষ্মরাত্রের কলকাতাকে একেবারে পাঠকের চোখের সামনে নিয়ে এসেছে। রাত ক্রমে গভীর, নির্জন, নিঃশব্দ হয়। জনহীন পথে দু-একজন মদ্যপ, থেকে-থেকে দু-একটা কুকুরের ডাক শোনা যায়। লেখক খুব দক্ষতার সঙ্গে একটি রাতের ক্রমশ গড়িয়ে চলা এবং ক্রমে সেই নির্জনতা একটু-একটু করে কেটে গিয়ে সকালের আবির্ভাবে ধীরে ধীরে জনবহুল ও কর্মমুখর হয়ে ওঠা—উৎসবে মেতে থাকা ছুটির দিনে যেমনটা ঘটা সম্ভব-- এঁকেছেন। ভোর রাত্রে প্রাতরাশের জন্যে খাবারের দোকানে ময়দা ঠাসা থেকে ক্রমান্বয়ে

মেয়েদের স্নানের পথে গল্প-গুজব, রাত্রে রাউণ্ড শেষে ঘুসখোর পুলিশ-দারোগার পকেট বোঝাই করে ঘরে ফেরা, এক-একটি করে দোকানপাট খুলে যাওয়া, ছুটির দিনে সরকারী কর্মচারী বাদে অন্যান্য অনেক বৃত্তিধারী মানুষ—যেমন জাহাজঘাটার কর্মীরা, কাপড়ের ফেরিওয়ালা, মাছ-তরিতরকারি, কিস্বা অন্যান্য খুচরো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সুযোগসন্ধানী দালালদেরও পথে দেখা যাচ্ছে। বাংলা কাগজের তেমন দাম নেই কিন্তু ইংরেজি খবরের কাগজ আসছে ঘরে-ঘরে, লক্ষণীয়। আলোচ্য অংশটিতে পয়সা ওড়ানো ‘বাবু’, আইনরক্ষক পুলিশ দারোগা, ডাক্তার, পূজারী, ধর্মপ্রচারক, মণিৎ ওয়াকে যাওয়া লোকজন, তখনকার শ্রেণীকরণ অনুযায়ী ‘উঁচু’ এবং ‘নিচু’ জাত, দালাল প্রমুখদের প্রতি কৌতুককর মন্তব্য আছে। আসলে ঠাট্টা নেই—এমন কোনো অংশই এখানে নেই। নকশার এই রীতি। হাসির মোড়কে চোখে আঙুল দিয়ে সমাজের অসঙ্গতিগুলোকে তুলে ধরা। সেখানে ‘হুতোম’ নিজেকেও রেয়াৎ করেননি। রাত্রে অনাচারের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে শহরময়। কলকাতা শহরের বেশ্যালয়গুলি যে তখনও পরিচিত দৃশ্যের মধ্যেই গণ্য হত, তা জানা যাচ্ছে। গ্রামীণ লোকেরা ভাগ্যের সন্ধান, মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির করতে বা শহরের কেতা দেখতে নানা সময়ে শহরে চলে আসছে। শহরে এসে এই সব সহজ সরল মানুষ ঠকছে, দালালের পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে—সে ছবি এই অংশে দেখতে পাওয়া যাবে। কেউ বা বেলেল্পাপনা করে পালিয়ে বাঁচছে। গ্রামগঞ্জ থেকে অনেক সময় পয়সাওয়ালা অথচ অজ্ঞ জমিদাররা কলকাতায় এসে সাজগোজ করে পয়সার অহঙ্কার দেখিয়ে বেড়াতে। ফলে দালালের সুবিধা হত। দালাল পয়সা নিয়ে তাদের ফিটন গাড়ি চড়িয়ে শহরের বিখ্যাত জায়গাগুলো দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে। সঙ্গে খ্যামটা নাচ, বারান্সনা-বিহারের মতো মনোরঞ্জনের নানা নেশা ধরিয়ে দিয়ে এদের নিঃস্ব করে ছেড়ে দিত।

কালীপ্রসন্নের কৌতুক সর্বস্তরের সমস্ত মানুষকে নিয়ে। তখন নতুন ইংরেজিয়ানার যুগ। বাঙালিরা অনেকেই ইংরাজি আদবকায়দা অনুকরণ করে নিজেদের আধুনিক প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। আবার অন্য এক দল এঁদের নিন্দা-সমালোচনা করে বেড়াতেন। লেখকের মতে, ইংরাজি আদবকায়দা জানা বাঙালিরা তখন দুই দলে বিভক্ত। প্রথম দলকে তিনি নাম দিয়েছেন, ‘উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বস্ট’। অর্থাৎ সাহেবদের অনুকরণ করতেন এত বেশি যে নিজস্বতা বলতে কিছুই আর বাকি ছিল না। দ্বিতীয় দলকে তিনি বলছেন, ‘ফিরিঙ্গির জঘন্য প্রতিক্রিয়া’। এঁরা স্বার্থপর, স্বনাম প্রচারের জন্য দেশের কাজ করেন। নিজেদের কেতাদুরস্ত করার জন্য এই শ্রেণীর বাঙালির অনুকরণপ্রিয়তা ছিল অতিমাত্রায় হাস্যকর। লেখক এই দুই দলের অসঙ্গতিগুলি নিয়েই মস্করা করেছেন।

চড়ক পার্বণের বিশেষ দিনটির কথায় আমরা অংশটি শেষ করেছি। ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মদের উৎসব, সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ নিয়েও লেখক পরিহাস করেছেন।, চড়কের গাছ তৈরি, কাঁসারিদের সঙ, ফ্যাশনের হালহকিকৎ বর্ণনা এখানে আছে। এক ভিন্নস্বাদের ভাষাশৈলী দিয়ে অধ্যায়টি সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

অত্যন্ত মনোগ্রাহী ভাষার হালকা চালে চলে কালীপ্রসন্ন যেন সমগ্র উনিশ শতকের পরিবর্তনশীল বাঙলাকে চলচ্ছবির মতো(ভিডিও) আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে শহর কলকাতার শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনযাপনের একটি মনোরম ব্যঙ্গচিত্র রচনা করে চলেছেন।

এবার নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলি পড়ুন এবং উপরের পাঠটি অনুসারে উত্তর করুন। পরে, অনুশীলনী অংশের শেষে দেওয়া উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১) নিচের প্রশ্নগুলির চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরে (✓) টিক চিহ্ন দিন।

ক) প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে

চড়কের দিনটির

☐

নীলপুজোর রাত্রির

☐

শীতল ষষ্ঠীর সকালের

☐

দুর্গাপুজোর দিনটির

☐

খ) ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে কোন ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে?

জুঁই

☐

মালতী

☐

পদ্ম

☐

বেল

☐

গ) মটন চাপ নিয়ে যাচ্ছে—

বাগবাজারের কসাইরা

☐

নদীয়ার মেছুনির দল

☐

চিংপুরের কসাইরা

ভদ্রেশ্বরের মাংসবিক্রেতারা

ঘ) যে নাচের তালিম হচ্ছে বলা হয়েছে—

খেমটা নাচ

বাঈ নাচ

ঝুমুর নাচ

ছৌ নাচ

ঙ) গন্ধ বেণেদের ব্যবসা হয়—

পিতলের

লোহার

তামার

সোনার

চ) যে ঘড়িতে টুং ঢং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে গেল—

গির্জার ঘড়িতে

রাস্তার ঘড়ি

বৈঠকখানার ঘড়ি

থানার ঘড়ি

ছ) পুলিশের সার্জন, দারোগা, জমাদারকে বলা হয়েছে

অমাবস্যার চাঁদ

ডুমুরের ফুল

গরিবের ঘম

বিলিতি

জ) আধবুড়ো বাতের রুগিরা কী করছেন?

সূর্য নমস্কার

মণিং ওয়াক

ইভনিং ওয়াক

গঙ্গান্নান

ঝ) হরকরা একটি--

ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র

মাসিক সংবাদপত্র

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

ইংরাজি মাসিকপত্রিকা

এ৩) পাগড়ি বাঁধা দলের প্রথম ইন্সটলমেন্টে রাস্তায় দেখা দিলেন—

সিপসরকার আর বুকিং ক্লার্ক

পরামাণিক ও রিপুকর্ম

ক্লার্ক ও কেরাণী

বুককিপার ও হেড রাইটার

২) উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ে শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন।

ক) আজ কাল _____ লেখাপড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধরে
আফিসে যান।

খ) _____ প্রায় উঠে গেল।

গ) _____ কাজটা ভালো, “নেপোয় মারে দইএর” মতন।

ঘ) কেউ _____ অনুরোধে চড়ক হেট করেন।

ঙ) অনেকে চড়ক, _____, তরওয়ালফোঁড়া দেখতে ভালবাসেন।

চ) অনেক পাড়াগাঁয়ে _____ ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ
করে থাকেন।

ছ) মোৎফরেক্লার তদ্বির করতে হলে _____ বাসার ঠিকানা হয়।

জ) কেউ কেউ ব্রাহ্ম হলেও “সাত পুরুষের _____” বলেই চড়কে
আমোদ করেন।

ঝ) _____ বারাগু ইয়ার গোচের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ।

ঞ) কোনো ব্রাহ্ম উপাচার্য _____ যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে
গোবর খেয়েছিলেন।

৩) রেখাঙ্কিত বা চিহ্নিত অক্ষরের শব্দ বা পদগুচ্ছের বদলে অনুচ্ছেদ থেকে বেছে উপযুক্ত
শব্দ বা পদগুচ্ছ বা সমার্থক বাগধারা লিখুন।

ক) দোকানে দোকানে দেওয়াল-লন্ঠন ঝুলছে।

খ) লোকে অবাক হয়ে খেমটা নাচ দেখছে।

গ) চৌমাথার চৌকিদারদের ভারি মজা!

ঘ) রাত ভোর হয়ে এলে শহরের সারা রাত বাইরে থাকা বাবুরা ঘরে ফিরলেন।

ঙ) পুলিশ, দারোগা প্রভৃতি রাত্রির রাউণ্ড শেষে ঘরে ফিরছেন।

চ) অনেকের আদায় মনের মতো না হওয়াতে গোটা শহরের উপর রাগে তাঁর গা
জ্বলছে।

ছ) শহুরে কবিরাজরা আবার ডাক্তারদের চেয়েও রসিক!

জ) পাড়াগাঁয়ের জমিদারদের মুক্তোর মালা পরা চেহারা যেন ব্যক্তিত্বহীন!

ঝ) সহরের বাবুরা অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্র লোক, বা তোষামুদে স্তাবক সঙ্গে নিয়ে
বেড়াতে বেরলেন।

৪) সঠিক অর্থটি বেছে লিখুন—

ক) বাণ-- লৌহ শলাকা, ত্রিশূল, তরওয়াল _____

খ) মোদা গাড়ী-- মোটা গাড়ি, মহিলা, মদে ভরা গাড়ি _____

গ) বোকো (এখান)-- ফুলের বোকে, সুগন্ধী, বোকা _____

ঘ) মেয়ে পাঁচালি -- মেয়েদের গানের দল, মেয়েদের গল্প, পাঁচালি _____

ঙ) কোরকাপ-- ছল-কপটতা, নিন্দামন্দ, গালিগালাজ _____

চ) রোঁদ-- রোদ, রান্না, টহল _____

ছ) ক্যাটি কৃষ্ট-- কৃষ্ণের কথা বলে যে, খৃষ্টের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে যে,

পাদরী সাহেব _____

জ) নম্বরওয়ারী -- নম্বর অনুযায়ী, নম্বরজাতীয়, নম্বর _____

ঝ) গোবরের বস্ট -- গোবরের স্তূপ, গোবরের ছড়া, গোবরের মূর্তি _____

১.৫.৭ নির্বাচিত পাঠ্যতালিকা

১) হুতোম প্যাঁচার নকশা- সম্পাদক- অরুণ নাগ

২) বাংলার সামাজিক ইতিহাস-বিনয় ঘোষ

১.৫.৮ উত্তর সংকেত

১) ক) নীলপুজোর রাত্রির খ)বেল গ)চিৎপুরের কসাইরা ঘ)খেমটা নাচ ঙ)সোনার
চ)গির্জার ঘড়িতে ছ)গরিবের ঘম জ)মর্ণিং ওয়াক ঝ)ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র
ঞ)সিপসরকার আর বুকিং ক্লার্ক

২) ক) ইংরাজি খ)পাগড়ি গ)দালালি ঘ)সিভিলিজেসনের ঙ)বাণফোঁড়া
চ) জমিদার ছ)ভবানীপুরেই জ)ক্রিয়াকাণ্ড ঝ)বেশ্যালয়ের ঞ) বিধবাবিবাহে

৩) ক) দেওয়াল গীরি খ)হাঁ করে গ)পোহা বারো ঘ)বারফটকা ঙ)রোঁদ চ) গা গস্
গস্ কচ্ছে ছ)এক কাটি সরেশ জ) বাঈজানের ভেড়ুয়া ঝ) মোসাহেব

৪) ক) লৌহ শলাকা খ) মদে ভরা গাড়ি গ)সুগন্ধী ঘ) মেয়েদের গানের দল
ঙ) ছল-কপটতা চ) টহল ছ) খৃষ্টের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে যে